জাতকের
গল্প

জাতকের
গল্প
কবিশেখর
শ্রীকালিদাস রায়
ওরিয়েন্ট
বুক কোম্পানি

INTERNATIONAL YEAR OF CHILD

FOR CHILDREN OF 10 TO 16 YEARS

JATAKER GALPA

By

KAVISEKHAR KALIDAS ROY

1982

Price : RS. TEN ONLY.

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে উপহার

১০ হইতে ১৬ বছর বয়সের শিশুদের জন্য

জাতকের গল্প

কবিশেখর কালিদাস রায়

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ সংস্করণ

১৯৮২

মূল্য : দশ টাকা

Published by Sri Prahlad Kumar Pramanik from Orient Book Company, C 29-31, College Street Market, First floor, Calcutta-700 007 and Printed by K. C. Pal at Nabajiban Press, 66, Grey Street, Calcutta-700 006.

আড়াই হাজার বৎসর আগে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এ দেশে নূতন ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। নূতন ধর্মপ্রচার করিতে হইলেই নূতন নূতন তত্ত্বকথা বলিতে হয়। তিনি যে সকল তত্ত্বকথা বলিয়াছিলেন, তাহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে নাই। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অর্থাৎ শ্রমণ ও ভিক্ষুরা গৃহস্থদের ও শ্রাবকদের বাড়ি বাড়ি গিয়া সে তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেন। কিন্তু তাহাই তো যথেষ্ট হইল না। সর্বদেশ, সর্বকাল ও সর্বশ্রেণীর লোককে তো বুঝানো চাই। বুদ্ধের ভক্তেরা সেই সকল তত্ত্বকথা সহজ সরল ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

বেদ-বেদান্তের কথা, উপনিষদের কথাও দেশের সাধারণ লোক বুঝিত না। আর্য ঋষিরা সাধারণ লোককে বুঝাইবার জন্য গল্পের সৃষ্টি করিয়াছিলেন—সেই গল্পগুলিই, পুরাণ নামে চলিতেছে। কোনো কঠিন জিনিস সাধারণ লোককে বুঝাইতে হইলেই গল্পচ্ছলে বলিতে হয়। বুদ্ধের ভক্তরাও বুদ্ধের সার কথাগুলি সাধারণ লোককে বুঝাইবার জন্য গল্পের সৃষ্টি করিলেন। এই গল্পগুলির নামই জাতকের গল্প। জাতকের গল্পগুলিই বৌদ্ধ পুরাণ।

এই গল্পগুলি একই সময়ে একই লোকে রচনা করেন নাই। বহু বৎসর ধরিয়া এই গল্পগুলি রচিত হইয়াছে। এই গল্পগুলি পালি ভাষাতে রচিত। পল্লীর লোকে সে ভাষা বুঝিত, তাই পল্লীভাষাই পালি ভাষা। সে ভাষার রূপ বদল হইয়া এখন বাংলা, হিন্দী, অসমীয়া ইত্যাদি ভাষা হইয়াছে। এখনকার লোকে পালি ভাষা বুঝে না। সেজন্য জাতকের গল্পগুলির পরিচয় এদেশের লোক অনেক দিন পর্যন্ত পায় নাই। জাতকের গল্পগুলির ইংরাজীতে তর্জমা হইয়াছিল। তাহা হইতে শিক্ষাব্রতী ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

অনেকে বলে, এ দেশের লোক গল্প লিখিতে পারে, কিন্তু গল্পের বিষয়বস্তু অর্থাৎ কাঠামো আবিষ্কার করিতে পারে না। আমাদের প্রাচীন বাংলা সাহিত্য পড়িলে তাহা মনে হয় বটে। পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী কবিরা একই শ্রীমন্ত সদাগর, চাঁদ সদাগর ও বিদ্যাসুন্দরের গল্পকেই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু জাতককথা পড়িলে মনে হয়—একদিন এদেশের লোক যেমন অজস্র গল্প লিখিতে পারিত, তেমনি অজস্র গল্পের প্লটও আবিষ্কার করিতে পারিত। জাতকের সব গল্পের প্লট অবশ্য তাহারা আবিষ্কার করে নাই। রামায়ণ, মহাভারত ও দেশবিদেশে প্রচলিত অনেক গল্পের বিষয়বস্তুও তাহারা লইয়াছিল ; কিন্তু আবিষ্কারই করিয়াছিল অনেক বেশি। রামায়ণ-মহাভারতের গল্প ও প্রচলিত গল্পগুলিকেও তাহারা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন ছাঁচে ঢালিয়া লইয়াছিল। হিন্দু আদর্শের তথ্যগুলিকে বৌদ্ধ আদর্শে পরিবর্তন করিয়াও লইয়াছিল। তাহাদের এই অজস্র গল্প-আবিষ্কারের শক্তি লক্ষ্য করিলে অবাক হইতে হয়। জাতককথা-গল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডার। জানি না, কতগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যাও অনেক বেশি।

আমাদের দেশের রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের পরই গল্প হিসাবে এই জাতককথার ঠাঁই।

জাতককথাগুলি বুদ্ধদেবের মুখের কথা নহে—বুদ্ধদেবের মুখে কথাগুলিকে বসানো হইয়াছে। বুদ্ধদেবের বাণীর সহিত গূঢ় সম্বন্ধ রাখিয়া এইগুলিকে লেখা হইয়াছে। বুদ্ধদেবেরই জীবনের সঙ্গে এইগুলির যোগ আছে, একথা না বলিলে লোকের শ্রদ্ধা হইবে কেন? লোকে গল্পের ভিতরকার সারমর্ম সন্ধান করিবার ক্লেশ স্বীকারই বা করিবে কেন? গল্পগুলির মহিমা বা মর্যাদাই বা স্বীকার করিবে কেন? সাদরে রক্ষা ও প্রচারই বা করিবে কেন? গল্পের ভিতরকার উপদেশগুলি অবশ্য বুদ্ধদেবেরই বটে!

প্রত্যেক গল্পের গোড়ায় আছে—ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীর রাজা, তখন বুদ্ধদেব অমুক হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এক ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বুদ্ধদেব বহুবার জন্মাইতে পারেন না। ওটা গল্পের ধরতা মাত্র। বৌদ্ধধর্মের প্রধান কথা এই—জীব বহুবার ইতর প্রাণী হইয়া জন্মায়, তারপর ক্রমে মানুষ হইয়া জন্মায়—তারপর সৎকর্ম করিলে ক্রমে সে সৎলোকের ঘরে জন্মায়, এমনি করিয়া জন্মে জন্মে তাহার উন্নতি হয়। শেষে অনেক জন্মের সৎকর্মের ফলে এবং কামনাজয়ের ফলে সে মহাপুরুষ হইয়া জন্মায়। মহাপুরুষ হইয়া সে সারাজীবন সৎকর্ম করে, সাধনা করে, জীবের কল্যাণসাধন করে—তপস্যা করিয়া একেবারে নিষ্কাম হইয়া যায়, তখন সে হয় বোধিসত্ত্ব।

বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—আমিও একজন্মে বোধিসত্ত্ব হই নাই। ইতর প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া বহু জন্ম পার হইয়া বহু সৎকর্ম করিয়া তবে এজন্মে বোধিসত্ত্ব হইয়াছি। জাতকের গল্পগুলি বোধিসত্ত্বের সেই জন্মগুলির কাল্পনিক উপাখ্যান। এক এক জন্মে তিনি এক একটি সৎকর্ম করিয়াছেন। তাঁহার ঐ সৎকর্মকে আশ্রয় করিয়া এক একটা গল্প রচিত হইয়াছে। তিনি যে সকল সৎকর্ম করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন, সেই সকল সৎকর্মের মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্য ঘটনাগুলির কল্পনা করা হইয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে—জন্মে জন্মে সৎকর্ম করিয়া কেমন করিয়া মুক্তির পথে আগাইতে হয়, বুদ্ধদেবের দোহাই দিয়া সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য গল্পগুলি রচিত হইয়াছে। যে জন্ম লাভ করে, সে-ই জাতক। বুদ্ধদেবকে বলা হয় মহাজাতক। মহাজাতকের জন্ম-জন্মান্তরের কথা বলিয়া এইগুলির নাম জাতককথা।

বুদ্ধদেবের উপদেশের সারকথা-প্রচার মূল উদ্দেশ্য হইলেও এগুলি গল্পাংশে নিকৃষ্ট নহে। বেশির ভাগ গল্পে গল্পটাই প্রধান হইয়াছে—উপদেশটি গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। অনেক গল্পে আবার কোন বিশিষ্ট উপদেশ নাই, কেবল দেখানো হইয়াছে বুদ্ধদেবের কোন একটা জন্মের সহিত ইহার যোগ মাত্র আছে। যাঁহারা খাঁটি কথাশিল্পী, তাঁহারা গল্পের কৌশলের উপরেই জোর দিয়াছেন, একবার শুধু বুদ্ধদেবের নাম করিয়াছেন।

সাহিত্য হিসাবে এইগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। সাহিত্যরস ছাড়া এইগুলি হইতে প্রাচীন ভারতের সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মজীবনের বহু তথ্য জানা যায় এবং ভারতের উচ্চ নৈতিক আদর্শ এইগুলির প্রধান উপজীব্য।

কালিদাস রায়

সূচীপত্র

বোধিসত্ত্ব এক জন্মে বারাণসীর নিকটে ক্ষেতের মজুর হইয়া জন্মিয়াছিলেন। তিনি একদিন যবের চারিটি লাড়ু কলার পাতায় জড়াইয়া লইয়া ক্ষেতে কাজ করিতে যাইতেছিলেন। পথে এক গাছ-তলায় তিনি চারিজন ভিক্ষুকে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। তাঁহাদের মুখ বড় মলিন। তাঁহাদের দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন তাঁহারা ক্ষুধার্ত। বোধিসত্ত্ব যবের লাড়ু কয়টির দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিলেন—কি করা যায়? লাড়ুগুলি অন্যের অখাদ্য বলিলেই হয়। এতে না আছে ঘি, না আছে চিনি। একটু তেল দিয়া ও একটু নুন দিয়া ঐগুলিকে পাকানো হইয়াছে। আবার এ-চিন্তাও মনে আসিল—চারিটি লাড়ু ভিক্ষুদিগকে দিলে হয়তো তাঁহারা ফেলিয়া দিবেন, অথচ তাঁহাকে সারাদিন উপবাসী থাকিতে হইবে। উপবাসী থাকিয়া পরিশ্রম করাও কঠিন।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বোধিসত্ত্ব শেষে লাড়ু চারিটি ভিক্ষু-দিগকে দিয়া প্রণাম করিলেন। ভিক্ষুরা লাড়ু পাইয়া খুব উল্লাসের

সহিত খাইয়া ফেলিলেন—তাহার পর পুকুরে নামিয়া জলপান করিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিলেন—''আচ্ছা, তুমি মুখের খাদ্য আমাদের দিলে, পরজন্মে তুমি রাজা হবে এবং এ-জন্মের কথা তোমার মনে থাকবে।''

* * * *

বোধিসত্ত্ব পরজন্মে বারাণসী-রাজের পুত্র হইয়া জন্মিলেন। বড় হইয়া তিনি ঐ নগরেরই এক শ্রেষ্ঠীকন্যাকে বিবাহ করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর বোধিসত্ত্ব রাজা হইলেন। রাজা হইয়া তিনি এমন দান করিতে আরম্ভ করিলেন যে, দেশে আর দরিদ্র থাকিল না। আশ্চর্যের বিষয়, রানীর হাত রাজার চেয়েও দরাজ। রাজা মনের আনন্দে প্রায়ই একটা গান করিতেন। গানের সুরটা রানীর খুব ভাল লাগিত, কিন্তু গানের অর্থ বুঝিতে পারিতেন না। একদিন রানী সাহস করিয়া রাজাকে গানের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন। রাজা বলিলেন—''মহিষী, গানের অর্থ বড় গোপনীয়। এর অর্থ তোমার শুনে কাজ নেই।''

রানী বলিলেন—''মহারাজ, দাসীকে মার্জনা করবেন। এর অর্থ না শুনে আমি ছাড়ব না।''

মহারাজ বলিলেন—''এর অর্থ শুনলে আমার উপর তোমার আর শ্রদ্ধা থাকবে না।''

রানী বলিলেন—''গানের অর্থ এমন কিছু হতে পারে না, যাতে আপনার উপর আমার ভক্তি টলতে পারে। আপনি যদি মহাপাপিষ্ঠ নরহন্তাও হন, তবুও আমি আপনাকে সম্মান ভক্তিই করব।''

রাজা বলিলেন—''এর অর্থ যদি বলতেই হয়, তবে পাত্রমিত্রের সামনেই রাজসভায় বলব। তখন তুমিও শুনে নিও। সকলেরই শোনা দরকার। কারণ এতে একটা বড় শিক্ষা আছে।''

যথা সময়ে রাজসভায় মহারাজ গানের অর্থ বলিতে লাগিলেন—''আপনারা সকলে শুনুন—গত জন্মে আমি বারাণসীর নিকট এক গাঁয়ে এক চাষার মজুর ছিলাম। চারজন ক্ষুধিত ভিক্ষুকে আমার দিনের আহার চারিটি লাড়ু খেতে দিয়েছিলাম। তাতে তাঁরা আমায় বর দেন—আমি জন্মান্তরে রাজা হব এবং আমার পূর্বজন্মের কথা

মনে থাকবে। একথা শুনেও যদি আমার উপর আপনাদের শ্রদ্ধা থাকে, তবেই বুঝব—আপনারা আমাকে সত্যই শ্রদ্ধা করেন।"

পাত্রমিত্র সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল—"না মহারাজ, আমাদের শ্রদ্ধা এতে বেড়েই গেল। আপনি পরম দাতা, তা তো দেখছি। তার উপর আপনি বোধিসত্ত্বের মত জাতিস্মর, তা জেনে আমাদের ভক্তি বহুগুণে বেড়ে গেল।"

রানী তখন বললেন—"তবে আপনারা শুনুন—আমারও পূর্বজন্মের কথা স্মরণে আছে। আমি পূর্বজন্মে বারাণসীর এক বৈদ্যের বাড়িতে দাসী ছিলাম। আমি দুপুরবেলা কাজ সেরে দু'বেলার ভাত নিয়ে বাড়ি যেতাম। একদিন গাছতলায় এক ভিক্ষুকে ক্ষুধিত বসে থাকতে দেখে সেই ভাতের থালা তাঁর সামনে রেখে দিলাম। তার পরদিনও ঐ ব্যাপার। তার পরদিনও ঐ ব্যাপার ঘটল। ঐ তিনদিন আমি একমুঠো করে ছাতু খেয়ে থাকতাম। চতুর্থ দিনে ঐ ভিক্ষু আমার অন্ন গ্রহণ না করে বললেন—"ভদ্রে, আমি আজ অভুক্ত নই। আজ তোমাকে বর দান করবার জন্য এখানে বসে আছি। পরজন্মে তুমি রানী হবে, আর তোমার এ জন্মের কথা মনে থাকবে। একথা এতদিন বলিনি—কারণ, একথা শুনলে আমার প্রতি কারো শ্রদ্ধা থাকবে না। রাজা নিজের কথা বললেন বলে সাহস পেয়ে আজ বলে ফেললাম।"

পাত্রমিত্রগণ বলিলেন—"মহারানি, আমাদের শ্রদ্ধা শতগুণ বেড়ে গেল।"

রাজা তখন বলিলেন—"দেখুন, দান অনেকেই করে। ধনীরা দান অনেক বেশিই করে। আমিও যথেষ্ট দান করেছি। কিন্তু পূর্বজন্মে আমি ও রানী যে দান করেছিলাম, তার তুলনা হয় না। দরিদ্রের দানের সঙ্গে ধনীর দানের তুলনা হয় না। তারপর মুখের আহার অন্যকে দান করার চেয়ে বড় দান আর নেই। দরিদ্রের পক্ষে মুখের আহার দান আর বুকের রুধির দান সমান।"

রাজভাণ্ডার খুলে দেছে যেবা দাতা নাহি কহি তারে।
সেই ত্যাগবীর, বুকের রুধির হেলায় যে দিতে পারে।

———
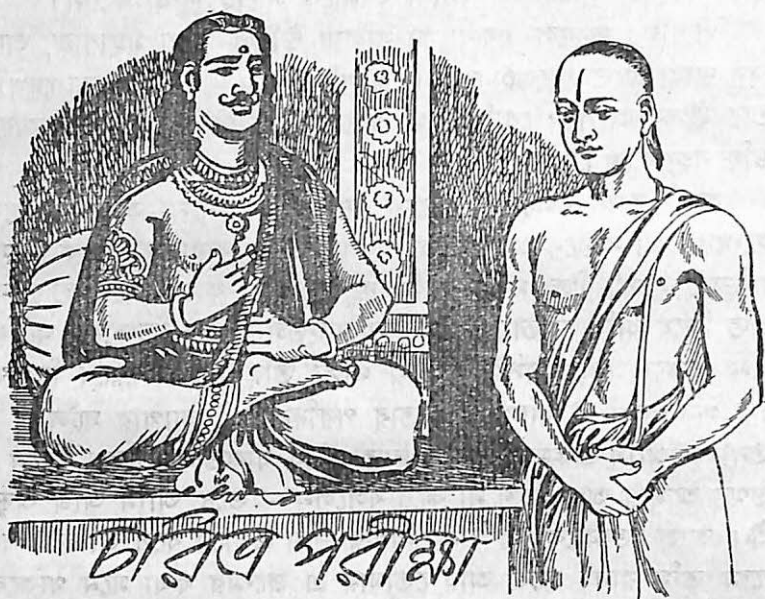
কোশলরাজ একজন মহাপ্রাজ্ঞ চরিত্রবান্ সুদর্শন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিজের গৃহে প্রতিপালন করিতেন। ক্রমে তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও ধর্ম-প্রাণতায় মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজা তাঁহার গুরুকে এতই ভক্তি করিতেন যে, ব্রাহ্মণ মনে মনে বড় লজ্জা পাইতেন। ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিতেন, তিনি এতটা ভক্তি পাইবার পাত্র নহেন—তাঁহার যত জ্ঞানই থাকুক, আর তিনি যত চরিত্রবানই হউন না কেন, তিনি যখন রাজপ্রাসাদে রাজগুরুর জীবন যাপন করিতেছেন, তখন তিনি অন্যান্য সকলের মতই একজন ভোগী গৃহী মাত্র, পারমার্থিক পথে তিনি অপর সকলের চেয়ে অধিক দূর অগ্রসর হন নাই।

তিনি একদিন ভাবিলেন—রাজা যে আমাকে এত ভক্তি করেন, তাহা কিসের জন্য, পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক ; আমার জ্ঞানের জন্য —না জাতি-কুলের জন্য—না ধর্মানুশীলনের জন্য—না চরিত্রের জন্য ?

এই সংকল্প করিয়া তিনি একদিন ধনপালের ফলক হইতে একটি স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিলেন। ধনপাল রাজগুরুকে ভক্তি করিতেন, দেখিয়াও কিছু বলিলেন না। দ্বিতীয় দিন আর একটি স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিলেন। ধনপাল সেদিনও কিছু বলিলেন না। তৃতীয় দিন ব্রাহ্মণ একমুঠা স্বর্ণমুদ্রা লইয়া যাইতেছিলেন, ধনপাল সেদিন ধরিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মণ পলাইতে চেষ্টা করিলেন না; স্বর্ণমুদ্রাগুলি ফেরতও দিলেন না। ধনপাল রাজাকে জানাইলেন। রাজা বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বয়ং দোষ স্বীকার করিলেন এবং মুদ্রা-গুলি রাজার হাতে দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা বড়ই দুঃখিত হইলেন—তাঁহার এতবড় মধুর স্বপ্ন ভাঙিগয়া গেল! তিনি বলিলেন—''ব্রাহ্মণ, আপনি এমন কাজ কেন করলেন? আপনাকে আমি গুরুর পদে বরণ করে আপনার দাসানুদাস হয়ে সেবা করছি। আপনাকে কত ধন উপহার দিয়েছি, আপনি তা গ্রহণ করেননি। অথচ আপনি সামান্য দশটি স্বর্ণমুদ্রার লোভ সামলাতে পারলেন না। আপনি প্রকাশ্যে ধরা পড়েছেন। এখন আপনাকে দণ্ড গ্রহণ করতে হবে। আপনাকে দণ্ড দিতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে—অথচ রাজধর্ম পালন করতে হবে। নতুবা লোকে আমাকে অবিচারক বলবে।''

ব্রাহ্মণ বলিলেন—''মহারাজ, আমি চাইলেই শত শত স্বর্ণমুদ্রা পেতে পারতাম। তা ছাড়া, আমার কোন অভাব নেই। তবু একাজ কেন করলাম—একবার ভেবে দেখ না। তারপর দণ্ডভোগ করব।''

রাজা বলিলেন—''আমি ত' কিছু বুঝতে পারছি না, ঠাকুর! সব আমার প্রহেলিকা বলে মনে হচ্ছে!'' ব্রাহ্মণ বলিলেন—''তবে শোন মহারাজ! আমি কেবল পরীক্ষা করে দেখছিলাম, আমি যে তোমার এত বেশী ভক্তির পাত্র, তা কিসের জন্য? আমার গভীর জ্ঞানের জন্য, না জাতি-কুলের জন্য, না চরিত্রের জন্য? এখন দেখলাম চরিত্রের জন্যই আমি এতদিন ভক্তিভাজন হয়ে ছিলাম। চরিত্র যদি যায়, তবে ব্রহ্মজ্ঞতা, বেদজ্ঞতা, বা জাতিধর্ম কিছুই বাঁচতে পারে না। জাতি-কুল বা বিদ্যা-জ্ঞান ইত্যাদি চরিত্রহীনকে একদিন দু'দিন পর্যন্ত বাঁচাতে পারে। তৃতীয় দিনে তারাও অক্ষম হয়ে পড়ে। এখন বুঝতে পেরেছি,

এই চরিত্রই মানুষের সবচেয়ে বড় বল ও সম্বল! সমাজ সংসারের মধ্যে থাকলে, বিশেষতঃ রাজৈশ্বর্যের মধ্যে গুরুর পদে বসে থাকলে ঐ চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ নির্মল করা কঠিন। তাই আমি আজই জেতবনে গিয়ে গৌতম বুদ্ধের শরণ নিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব।''

রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—''রাজন্, তোমার কোন দোষ নেই ; তুমি আপন রাজধর্মই পালন করেছ। তুমি যদি দণ্ড দিতে না চাইতে, তা হলে চরিত্রের মর্যাদার প্রকৃত পরীক্ষাই হ'ত না।''

রাজা ও ব্রাহ্মণের স্ত্রী-পুত্র সকলেই তাঁহাকে সংসারত্যাগের সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু ব্রাহ্মণ কোন নিষেধ না শুনিয়া জেতবনের বিহারে চলিয়া গেলেন।
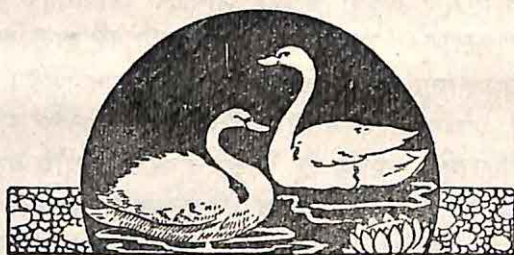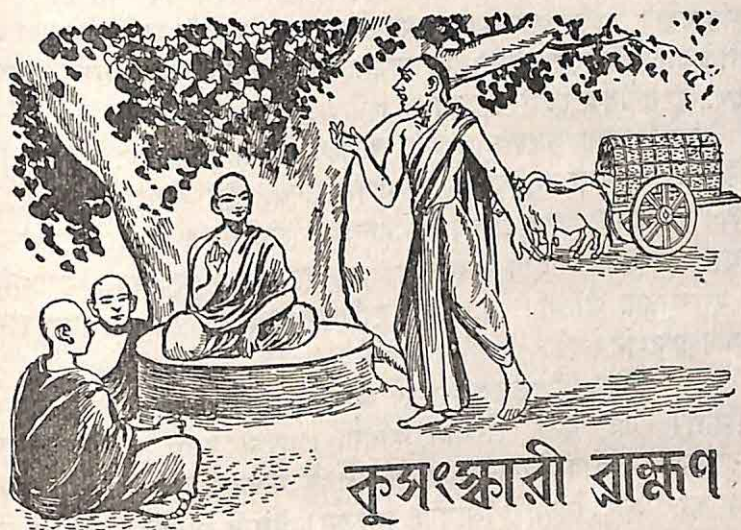
কুসংস্কারী ব্রাহ্মণ

বুদ্ধদেব যখন রাজগৃহের বিহারে বাস করিতেছিলেন, তখন রাজগৃহের সকলেই একে একে তাঁহার নিকট আসিয়া শ্রীমুখের বাণী শুনিয়া প্রকৃত ধর্মের মর্ম উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। একজন ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবকে এড়াইয়া চলিতেন এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্মের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতেন। এ ব্যক্তির অগাধ ধনসম্পত্তি ছিল। যত প্রকারের কুসংস্কার সে যুগের হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল, ব্রাহ্মণ সেগুলিকে কাঁটায় কাঁটায় মানিয়া চলিতেন। ব্রাহ্মণের চৈতন্যোদয়ের জন্য তথাগত (বুদ্ধদেব) সুযোগ খুঁজিতেছিলেন।

ব্রাহ্মণ একদিন স্নানান্তে বস্ত্রপরিবর্তনের সময় জানিতে পারিলেন—তাঁহার বহুমূল্য একজোড়া কাপড়-চাদর ইঁদুরে কাটিয়াছে। শুনিয়া ব্রাহ্মণ চমকিয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণের বিশ্বাস,—ঐ বস্ত্র যে পরিধান করিবে, তাহার এবং তাহার পরিবারস্থ সকলের মৃত্যু হইবে। যে স্পর্শ করিবে, তাহারও অমঙ্গল হইতে পারে। ব্রাহ্মণ ঐ পরিচ্ছদ শ্মশানে ত্যাগ করিয়া আসিতে আদেশ দিলেন। ভৃত্যদিগকে এ ভার

দিতে পারিলেন না। ভয়—পাছে তাহারা লোভবশে উহা আপন গৃহে লইয়া যায়। তিনি আপন পুত্রকে বলিলেন—"একটা লাঠির ডগায় ঐ কাপড়-চাদর জড়িয়ে শ্মশানে ফেলে দিয়ে স্নান করে বাড়ী এস। দেখো, যেন কিছুতেই ছুঁয়ো না।

পুত্র পিতার আদেশমত মরা সাপকে যেমন লোকে লাঠির ডগায় করিয়া লইয়া যায়, সেইভাবে ঐ কাপড়-চাদর লইয়া শ্মশানে ফেলিতে গেল। ছেলেটি যেমন ঐ কাপড়-চাদর ফেলিয়া দিল অমনি বুদ্ধদেব তাহা কুড়াইয়া লইয়া কোমরে জড়াইতে লাগিলেন। ছেলেটি হা হা করিয়া উঠিল। বুদ্ধদেব হাসিতে হাসিতে বেণুবনের দিকে চলিয়া গেলেন।

পুত্র আসিয়া পিতাকে সংবাদ জানাইলেন। পিতা দেখিলেন—সর্বনাশ! এই বস্ত্র পরিধান করিয়া গৌতম বুদ্ধ ত' দেহত্যাগ করিবেনই—তাঁহার শিষ্য-সেবক সকলেরই মৃত্যু হইবে। মনে মনে বলিলেন, "হায়, বিধর্মী নির্বোধ গৌতম! ইহার যে কী কুফল, তাহা ত' জান না!" ব্রাহ্মণ ভাবিলেন—এতগুলি নরহত্যার জন্য তিনিই দায়ী হইতে চলিলেন। তখন তিনি গৃহে যত বস্ত্র ছিল, সমস্ত গাড়ীর উপর চাপাইয়া এবং প্রচুর ধনরত্ন লইয়া বেণুবন বিহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বুদ্ধদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"গৌতম, তুমি জান, ইঁদুরে-কাটা কাপড় পরলে কী ভীষণ অমঙ্গল হয়। তুমি এখনি ঐ বস্ত্র ত্যাগ কর। দেখ, তোমার ও তোমার শ্রমণ-গণের জন্য আমি কত বস্ত্র এনেছি! তোমার বস্ত্রক্রয়ের জন্য আমি সহস্র মুদ্রা দান করছি।"

গৌতম বলিলেন—"ব্রাহ্মণ, এসব বস্ত্র নিয়ে আমরা কি করব? আমরা পথে-ঘাটে, জঞ্জাল-আবর্জনার মধ্যে শ্মশানে যে টুক্‌রো-টুক্‌রো কাপড় পাই, তা-ই পরি। আমাদের অন্য বস্ত্র পরতে নেই; যে কাপড় ইঁদুরে-কাটা এবং শ্মশানে নিক্ষেপ-করা, সেই কাপড়ই আমাদের পরিধেয়। ব্রাহ্মণ, তুমি কুসংস্কারে অন্ধ, হাজার রকমের অলীক কাল্পনিক ভয়ে তুমি বেঁচে থেকেও মরে আছ। আমরা জগতে সকল ভয় জয় করেছি। যদি নির্ভয়ে বাঁচতে চাও—তবে আমরা যা

করে, তা-ই কর। কুসংস্কারগুলো তোমার ঘরে সাপের মত কিলবিল করছে, তুমি সাপের ডেরায় বাস করছ। সারারাত তুমি দুঃস্বপ্ন দেখ, সারাদিন তোমার সেই দুশ্চিন্তায় কাটে। স্বপ্নগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করে তুমি কি যাতনাই না পাচ্ছ! প্রত্যেক জীবজন্তুর চলা-ফেরায় তুমি মঙ্গল-অমঙ্গল খুঁজে অস্থির হচ্ছ! কাক ডাকলে তুমি চমকে ওঠ, পেঁচা ডাকলে তুমি ভাব স্বয়ং মৃত্যু ডাকছে, টিকটিকি পড়লে তোমার শান্তি নষ্ট হয়, রাত্রিকালে আকাশের দিকে তোমার চাইবার উপায় নাই, কখন্ উল্কাপাত দেখে ফেলবে! ভেবে দেখ দেখি, কী ভীষণ জীবন যাপন করছ!''

এইভাবে বুদ্ধদেব তাহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই উপ-দেশে ব্রাহ্মণের চৈতন্যোদয় হইল।

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসী নগরে একটি বড় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ছিলেন। পাঁচশত ছাত্র তাঁহার কাছে শিক্ষালাভ করিত। তাহাদের মধ্যে একটি শিষ্য এতই নির্বোধ ছিল যে, কিছুতেই তাহার মাথায় কিছুই ঢুকিত না। কিন্তু তাহার একটি গুণ ছিল—তাহার মত গুরুসেবা কেহই করিতে পারিত না। তজ্জন্য আচার্য তাহাকে বড় স্নেহ করিতেন।

আচার্য আহারের পর যখন শয্যায় শয়ন করিতেন, তখন সে প্রত্যহ তাঁহার পা টিপিয়া দিত—আচার্যের নিদ্রা আসিলে সে নিজে নিদ্রা যাইত। একদিন এইভাবে আচার্য নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, চলিয়া যাইবার সময় সে দেখিল—খাটের একটি পায়া ভাঙিয়া গিয়াছে। ছাত্রটি খাটের পায়াটিকে ঠিক করিয়া দিতে গিয়া দেখিল—আচার্য যদি ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরিতে যান, তাহা হইলে খাট ভাঙিয়া

পড়িয়া যাইবেন। তখন কোন উপায় ঠিক করিতে না পারিয়া শিষ্যটি আপনার ঘাড়ে খাটের একটি কোণ চাপাইয়া সারারাত্রি বসিয়া কাটাইল। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে আচার্য শিষ্যকে এভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শিষ্য তাহার সমস্যার কথা বলিলে গুরু শিষ্যের ভক্তি লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। গুরু ভাবিতে লাগিলেন—এমন ভক্তের যদি বিদ্যা না হয়, তাহা হইলে গুরুর পক্ষে বড়ই লজ্জার বিষয়।

গুরু দেখিলেন—কোন প্রকারে ইহার বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত করিতে হইবে—'উপমানের' সাহায্যে ইহার বুদ্ধির উন্মেষের চেষ্টা করা যাক। প্রত্যহ ইহাকে নগরভ্রমণে পাঠানো যাইবে, তারপর কি কি দেখিয়া আসিয়াছে, জিজ্ঞাসা করা হইবে—যাহা যাহা দেখিয়াছে, তাহা কিসের মত জিজ্ঞাসা করিলে বাধ্য হইয়া শিষ্যকে 'উপমান' প্রয়োগ করিয়া বুঝাইতে হইবে, তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ সাধিত হইতে পারে।

প্রথম দিন শিষ্য ফিরিয়া আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—''তুমি আজ কি দেখেছ?''

শিষ্য—আজ একটি সাপ দেখেছি।

গুরু—আচ্ছা, বল তো সাপ কিসের মত?

শিষ্য—লাঙ্গলের ঈষের মত।

গুরু ভাবিয়া দেখিলেন—হ্যাঁ, অনেকটা লাঙ্গলের ঈষের মতই বটে। প্রথম-প্রথম ঠিক হইবে না—কাছাকাছি যাইবে—তারপর ক্রমে উপমানের বোধ নিশ্চয় বাড়িবে। দ্বিতীয় দিন শিষ্য ফিরিয়া আসিলে গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন—''আজ কি দেখলে, বৎস?''

শিষ্য—আজ রাজপথে একটি হাতী দেখেছি।

গুরু—বল দেখি হাতী কিসের মত?

শিষ্য না ভাবিয়া চিন্তিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বলিল—লাঙ্গলের ঈষের মত।

গুরু ভাবিয়া দেখিলেন সমগ্র হস্তীটার কথা শিষ্য ভাবিতে পারে নাই। শুঁড় ও দন্তের কথাই ভাবিয়াছে। অংশটাই লক্ষ্য করিয়াছে, ক্রমে সমগ্রটার সম্বন্ধে জ্ঞান হইবে। তৃতীয় দিন শিষ্য ফিরিয়া

আসিলে গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ কি দেখলে, বৎস?"

শিষ্য—আজ এক গৃহস্থের বাড়িতে গুড়-জল দেখেছি।

গুরু—আচ্ছা বল দেখি, গুড় কিসের মত?

শিষ্য বিনা দ্বিধায় বলিয়া বসিল—লাঙগলের ঈষের মত।

গুরু আরও অবাক হইয়া গেলেন—গুড়ের সঙেগ লাঙগলের ঈষের সাদৃশ্য কোথা?

অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন—গুড়ের সঙেগ মধুর সাদৃশ্য আছে—মধু থাকে মৌচাকে—মৌচাক অনেক সময় গাছে লাঙগলের ঈষের মত শুক্‌না ডালে ঝুলে। ঐরূপ একটা ডালে চতুষ্পাঠীর প্রাঙগণেই একটা মৌচাক ঝুলিতেছে।

গুরু দেখিলেন—শিষ্য ক্রমেই তাঁহার উদ্দেশ্য হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। তখন তিনি হতাশ হইয়া বলিলেন,—"বাপু, তোমার মত গুরুভক্ত শিষ্য আমার আর মিলবে না; কিন্তু স্বার্থের জন্য তোমাকে এখানে ধরে রাখা ঠিক নয়। তুমি লাঙগলের ঈষ ছাড়া কিছুই জান না—তোমার মাথাটিও দেখছি লাঙগলের ঈষের মত, তুমি গ্রামে গিয়ে লাঙগলের ঈষের চর্চা কর গে—অর্থাৎ চাষবাস কর গে। এ ঠাঁই তোমার নয়।"

বোধিসত্ত্ব একজন্মে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের মন্ত্রী হইয়া তাঁহার রাজকার্য পরিদর্শন করিতেন। একদিন মহারাজ রাজপ্রাসাদের জানালা খুলিয়া দেখিলেন, একটি পরমা সুন্দরী বালিকা রাজপথ দিয়া বদরীফল অর্থাৎ কুল বিক্রয় করিতে করিতে যাইতেছে। ''কুল নেবে গো''—এই কথা সে এমনি মধুর সুরে বলিতেছে যে, রাজার কানে তাহা স্বর্গীয় সংগীতের মত ধ্বনিত হইতে লাগিল—একসঙ্গে যেন শত শত বেণুবীণা বাজিয়া উঠিল। তাহাকে দেখিয়া এবং তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাজার মনে হইল, এ বালিকা রাজরানী হইবার যোগ্য। মহারাজ তখনি তাহাকে রাজপ্রাসাদে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাহার বিধবা মাতার নিকট হইতে তাহাকে চাহিয়া লইয়া তাহাকে রানী করিলেন। তাহার জাতি-জন্মের কোন গৌরব নাই, আদর করিয়া রাজা তাহার নাম দিলেন 'সুজাতা'।

ইহার দুই বৎসর পর রাজা একদিন সোনার পাত্রে বৈকালে ফল ভক্ষণ করিতেছিলেন। নানাবিধ ফলের সঙ্গে কয়েকটি কুলও ছিল। সে-সকল ফল সুজাতা আগে কখনও দেখে নাই, রাজপ্রাসাদে আসিয়া প্রথম দেখিতেছে। সে-সব ফলসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করিয়া সে কুল-গুলির দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—"মহারাজ, গোল গোল লাল লাল ঐ ফলগুলির নাম কি?"

এই প্রশ্নে রাজার ধৈর্যচ্যুতি হইল। রাজা ভাবিলেন—যে কুল-ওয়ালী পথে পথে কুল বিক্রি করিয়া বেড়াইত, সে কিনা আজ রাজ-রানী হইয়া কুল চিনিতে পারিতেছে না! ধনমোহে ইহার ত' তাহা হইলে মস্তিষ্কের দারুণ বিকার ঘটিয়াছে। ইহার সমুচিত দণ্ড-বিধানের প্রয়োজন। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন—"রানী হয়ে তোর মাথা বিগড়ে গেছে। তোর যোগ্য ঠাঁই নগরপ্রান্তের পাতার কুঁড়ে। একদিন যে-ফল কুড়িয়ে ঝুড়ি ভরে পথে পথে বিক্রি করতিস্, যে-ফল তোর ভাত যোগাত—এ ফল তা-ই। দু'বছরেই তুই তা ভুলে গেলি? তোর চরিত্র বেশ বুঝেছি। দূর হ' হতভাগিনী, যে অবস্থায় ছিলি সে অবস্থায় ফিরে যা।"

সুজাতা দীনবেশে রাজপুরী হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইতেছে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাকে ফিরাইয়া আনিলেন। মহারাজের কাছে তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া গিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন—"এ অপরাধ সুজাতার নয়। মানুষের স্বাভাবিক ধর্মই এই। সুজাতা কোনদিন রাজপুরীতে ঠাঁই পাবে প্রত্যাশাও করেনি। তাকে জোর করে আশা-তীত গৌরব দিয়ে আজ অপমান করে বিদায় দিলে চলবে কেন? রাজবংশের জন্য সে তো আপনাকে প্রস্তুত করেনি! তার জাতি-জন্ম বিচার করে, গুণ দেখে, চরিত্র দেখে তাকে গ্রহণ করেন নি! তার রূপ দেখেই তাকে রানী করেছিলেন। রাজপুরীতে এসে তার সে রূপ শতগুণে বেড়ে গেছে। যা দেখে তাকে ঘরে এনেছেন, তা-ই নিয়েই আপনার তুষ্ট থাকা উচিত। তার বেশী তার কাছে চাওয়া অন্যায়। যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে—তবে আপনারই হয়েছে। আপনার তো পথের কাঙালিনীকে বিয়ে করবার কথা নয়। যদি করেই থাকেন

—তবে নিজের পত্নীকে তুচ্ছ কারণে ত্যাগ করা চলবে না। রানী হয়ে সুজাতার মাথা বিগড়েছে—আর রাজা হয়ে আপনার মাথা এমনি বিগড়েছে যে পথের কাঙালিনীকে রানী করেছেন! আপনি সদ্বংশ-জাত, বিদ্বান, গুণবান, প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আপনার যদি মাথা বিগড়ায় তবে একজন অশিক্ষিতা নীচবংশীয়া বালিকার মাথা বিগড়াবে, তাতে আর আশ্চর্য কি?''

বোধিসত্ত্বের উপদেশে লজ্জা পাইয়া রাজা সুজাতাকে ক্ষমা করিলেন।

সুজাতা বোধিসত্ত্বকে বলিলেন—''মহাত্মন্, আমি ইচ্ছা করে কুল চিনিনি, একথা সত্য নয়। কুল অতি তুচ্ছ ফল; মহারাজের সোনার ভোজনপাত্রে ঐরূপ তুচ্ছ ফল থাকবে, আমি ভাবতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম—ওগুলো বুঝি অন্য কোন উপাদেয় ফল। যাই হোক, রানীগিরির শখ আমার মিটেছে। এত তুচ্ছ কারণে গভীর-ভাবে কোন বিষয়ে চিন্তা বা বিবেচনা না করে যিনি নিজের রানীকে দূর করে দিতে পারেন—তাঁর সংসারে আমার ঠাঁই নেই। আমি মহারাজের ক্ষমা চাই না। আমি বিদায় নিলাম।''

বোধিসত্ত্ব সুজাতাকে ভিক্ষুণীদের মঠে পাঠাইয়া দিলেন। সুজাতা রানীগিরি ছাড়িয়া ভিক্ষুণী হইলেন। রাজা অনুতপ্ত হইয়া সুজাতার মতপরিবর্তনের চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু সুজাতা কিছুতেই আর রাজসংসারে ফিরিলেন না।

বোধিসত্ত্ব একবার এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তখন তিনটি কন্যা জন্মে। বেশীদিন পত্নী ও কন্যাদিগকে লইয়া তিনি সংসার-সুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। যৌবনেই তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর তিনি সোনার হাঁস হইয়া জন্মিলেন; কিন্তু পূর্বজন্মের কথা তাঁহার মনে ছিল। তখন তিনি হিমালয়প্রদেশের হ্রদ হইতে সমতলের গ্রামে আসিয়া পত্নী ও কন্যাদের সন্ধান করিতে লাগিলেন। তাহাদের জন্য তাঁহার মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। সন্ধান করিয়া তিনি দেখিলেন—তাহারা একটি কুটীরে বাস করে এবং পরের গৃহে দাসীবৃত্তি করিয়া অতিকষ্টে সংসার চালায়। তাহাদের দুর্দশা দেখিয়া বোধিসত্ত্বের অন্তর বিগলিত হইল। তিনি ভাবিলেন —তাঁহার দেহে ত' অনেক সোনার পালখ রহিয়াছে, মাসে মাসে এক-একটি পালখ দিলে উহাদের দুঃখ ঘুচিতে পারে।

এই সংকল্প করিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাদের ঘরের চালের উপর বসিলেন এবং মানুষের কণ্ঠে পত্নীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন— ''ভদ্রে, পূর্বজন্মে আমি তোমার স্বামী ছিলাম। তোমাদের দুর্দশা

দেখে আমার মনে বড় কষ্ট হচ্ছে। আমি একটি করে সোনার পালখ দিয়ে যাব, তা বিক্রয় করে তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাক—কন্যাদের একে একে বিয়ে দাও।"

এই বলিয়া তিনি প্রথম দিন আট-নয় মাষা ওজনের একটি পালখ দিয়া চলিয়া গেলেন। এইরূপ মাসে মাসে তিনি আসিতেন, আর পালখ দিয়া চলিয়া যাইতেন। মেয়েরা তাঁহার গায়ে হাত বুলাইত,—বোধিসত্ত্ব তাহাতে সুখবোধ করিতেন।

ব্রাহ্মণী একদিন মনে মনে ভাবিল—এইভাবে একটি একটি করিয়া পালখ লইয়া বিশেষ সুবিধা হইতেছে না। ইনিই বা কত দিন আসিবেন, তাহারই বা ঠিক কি? কিছুদিন বাদে না আসিতেও পারেন। তাহার চেয়ে একদিন ইঁহাকে ধরিয়া পালখগুলি সব ছিঁড়িয়া লইলে একদিনেই আমরা বড়লোক হইতে পারি।

ব্রাহ্মণী এ প্রস্তাব মেয়েদের জানাইল। ইহাতে মেয়েরা রাজী হইল না। তাহারা মাকে বার বার নিষেধ করিয়া বলিল—"মা, আমাদের তাড়াতাড়ি ধনী হয়ে কাজ নেই, আমাদের দুঃখ ঘুচেছে—এ-ই যথেষ্ট। বাবাকে কষ্ট দিয়ে অমন কাজ করো না। পালখগুলি উপড়ে নিলে বাবা আর উড়তে পারবে না—তাতে তিনি মারাও যেতে পারেন।"

কিন্তু ব্রাহ্মণী এই যুক্তি শুনিল না। বোধিসত্ত্ব আসিবামাত্র তাহাকে আদর করিবার ছলে কোলে তুলিয়া লইয়া হাত দিয়া গলা চাপিয়া ধরিল এবং একে একে সবগুলি পালখ উপড়াইয়া লইল। বোধিসত্ত্ব যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। তিনি যতই আর্তনাদ করিতে লাগিলেন, উপড়ানো সোনার পালখগুলি ততই সাদা হইয়া সাধারণ হাঁসের পালখের রূপ ধরিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব উড়িবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু উড়িতে পারিলেন না,—কুটিরেই থাকিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণী তখন 'হায় হায়' করিতে লাগিলেন। কন্যারা বোধিসত্ত্বকে আহারাদি দিয়া বাঁচাইয়া রাখিল।

কিছুদিন পরে বোধিসত্ত্বের দেহে নূতন পালখ বাহির হইল। এবার যে-সমস্ত পালখ বাহির হইল, সেগুলি সোনার নয়—সাধারণ

হাঁসের পালখ। তারপর একদিন তিনি আকাশে উড়িয়া গেলেন। কন্যারা জননীকে ধিক্কার দিতে লাগিল। ব্রাহ্মণী অতিলোভের দণ্ড হাতে হাতে লাভ করিল।

দৈব যাহা দেয় তাহাতে তুষ্ট যে-জন নয়,
কইব কি তার সাজার কথা, এম্‌নি ধারাই হয়।
লোভ-লালসার মাত্রা আছে ; ছাড়িয়ে যদি যাও,
যা পেতে হায়, তা-ও হারাবে, যা পেয়েছ তা-ও।

মগধরাজ্যে রাজগৃহ নগরে শঙ্খ বণিক্ নামে এক মহাশ্রেষ্ঠী ছিলেন। বারাণসী নগরে পিলিয় নামে আর এক ধনকুবের বণিক্ ছিলেন। দুইজনের মধ্যে যথেষ্ট মৈত্রী ছিল। বারাণসী ও রাজগৃহের মধ্যে বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল ; বাণিজ্য উপলক্ষে দুইজনের প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হইত। দৈবদুর্বিপাকে পিলিয়ের বহুসহস্রশকট পণ্যদ্রব্য ডাকাতে লুটিয়া লইল। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি রাজভাণ্ডারে ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠীদের নিকট ঋণ করিলেন। শেষে ঋণের দায়ে পিলিয় সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন পিলিয় স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া রাজগৃহে বন্ধুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বন্ধু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া পাশে বসাইয়া কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। পিলিয় বলিলেন, "ভাই, আমার সর্বস্ব গিয়াছে। আমি আজ পথের ফকির, তোমার কাছে সাহায্যভিক্ষায় এলাম।" শঙ্খ

বলিলেন, "সে আর বেশী কথা কি, তুমি আমার সহোদর ভাইয়ের চেয়েও বেশী। আমার অর্ধেক তোমার। আমার দাসদাসী, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিরও অর্ধেক তুমি নাও। তোমাকে দিয়েও আমার যথেষ্ট থাকবে।" পিলিয় অম্লানবদনে বন্ধুর সম্পত্তির অর্ধেক অধিকার করিয়া বারাণসী নগরে ফিরিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে শঙ্খের দুর্দিন উপস্থিত হইল। ক্রমে শঙ্খও সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি ভাবিলেন—"যাই, এখন বন্ধুর কাছে। বন্ধু ত' বটেই—তাছাড়া তাকে আমার সর্বস্বের অর্ধেক দিয়েছি, সে নিশ্চয়ই আশ্রয় দেবে।"

শঙ্খ পত্নীকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। বারাণসীতে প্রবেশ করিয়া শঙ্খ পত্নীকে বলিলেন—"যদিও আমাদের দুরবস্থা হয়েছে, তা হলেও তুমি নগরের পথ দিয়ে হেঁটে বন্ধুর বাড়ীতে যাবে, সেটা ভাল দেখায় না। তুমি এই ধর্মশালায় অপেক্ষা কর, আমি বন্ধুর ভবনে গিয়ে তোমার জন্য যানবাহন পাঠিয়ে দিচ্ছি।" পত্নী সম্মত হইলেন। শঙ্খ পত্নীকে রাখিয়া বন্ধুর গৃহে গেলেন। শঙ্খকে দেখিয়াই বন্ধু বুঝিতে পারিলেন, শঙ্খ পথের ভিখারী হইয়াছে। তিনি শঙ্খকে আদর-আপ্যায়ন করিলেন না—বলিলেন, "কোথা উঠেছ?"

শঙ্খ—আমি এক ধর্মশালায় উঠেছি, কিন্তু সেখানে খাব কি? আমার সর্বস্ব গিয়েছে; তাই তোমার আশ্রয়েই এলাম।

পিলিয়—এখানে আশ্রয়-টাশ্রয় মিলবে না। নিজের দোষে সর্বস্ব হারিয়েছ। তোমার প্রতি আমার দয়া নেই। তাছাড়া তোমার উপর শনির দৃষ্টি পড়েছে। তোমাকে আমি আশ্রয় দিলে, আমারও ক্ষতি হবে। তুমি এখনি পথ দেখ।

শঙ্খ—পথ ত' শেষ পর্যন্ত আছেই, ভাই! রাজগৃহ হতে তোমার কৃপার আশায় এতদূর এলাম। সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় হব? আমার পত্নী ধর্মশালায় রয়েছেন। আমাদের দু'দিন খাওয়া হয়নি।

পিলিয়—খাওয়া হয়নি ত' আমি কি করব? আচ্ছা, এক-আড়ি ক্ষুদ দিচ্ছি। তাই নিয়ে বিদায় হও; এদিকে আর এস না।

শংখ একবার ভাবিলেন, ক্ষুদ লইতে অসম্মতি প্রকাশ করেন, কিন্তু কি ভাবিয়া ক্ষুদ লইয়া ধর্মশালায় ফিরিয়া গেলেন। পত্নী এ সংবাদ শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—ক্ষুদগুলি রাগিয়া ছড়াইয়া ফেলিলেন। তাঁহার কান্না শুনিয়া শংখের পূর্বতন দাস একজন সেখানে উপস্থিত হইল।

সে বলিল, "মা, কাঁদবেন না। ভয় কি? আসুন আমার গৃহে, আমি গরীব বটে, কিন্তু আমরা আপনার পুরানো দাস যারা আছি, সকলে মিলে আপনাদের ভার নেব।" রাজগৃহের শ্রেষ্ঠীরাজ তখন পত্নীকে সংগে লইয়া দাসগৃহে উপস্থিত হইলেন! দাসদাসীরা সকলে মিলিয়া তাঁহার সেবা-পরিচর্যা করিতে লাগিল। তাঁহারা ইহাতেই তুষ্ট হইল না, দল বাঁধিয়া ব্রহ্মদত্তের নিকট পিলিয়ের বিরুদ্ধে নালিশ করিল। রাজা দুইজন শ্রেষ্ঠীকেই রাজসভায় তলব দিলেন এবং দুই বন্ধু পরস্পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। পিলিয় যে শংখের সর্বস্বের অর্ধেক পাইয়াছে, তাহা তাহাকে স্বীকার করিতে হইল। রাজা তখন বিচার করিয়া অমাত্যদের বলিলেন, "এত বড় অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড আমার নগরে যদি বাস করে তবে রাজ্যের অমংগল হবে; আমারও রাজ্যশাসনের গৌরব রক্ষিত হবে না। ঐ পাষণ্ড যদি ধনকুবের হয়ে সবার সম্মানলাভ করতে থাকে, তা হলে বড়ই অনাচার হবে। ন্যায়ের চক্ষে এটা অতি অশোভন হবে। এইজন্য আমি আদেশ করছি, তোমরা পিলিয়ের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে শংখশ্রেষ্ঠীকে দান কর—যাতে শংখ বণিক্ স্বচ্ছন্দে কাল কাটাতে পারে। তাতে আমার ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা পাবে। মহাপ্রেত ওটা, সর্বস্বের বদলে এক আঢ় ক্ষুদ দেয়!"

শংখ বলিলেন, "প্রভু, আমার বন্ধুর সর্বস্বে কাজ নাই, আমি দত্তধন কিছুতেই ফিরে নেব না। আমি আর ধনকুবের হতে চাই না। ধনে যে কোন সুখ নেই, তা আমি বুঝেছি। বন্ধু আমার সকল সম্পত্তি ভোগ করুক, কোন আপত্তি নেই। আমি তার কাছে সম্পদ চাইনি—আমি চেয়েছিলুম একটু আশ্রয় ও দু'মুঠো অন্ন।"

রাজা বলিলেন, "ধন্য ধন্য মহাশ্রেষ্ঠী শংখ! আপনার মত আদর্শ

মহাপুরুষ আমার বারাণসীর অধিবাসী হয়ে থাকবেন, এতেই আমি ধন্য হলাম। তা-ই হবে—আপনার যাতে সুখে স্বচ্ছন্দে ও নির্ভাবনায় চলে যায়, তাই করছি। কিন্তু ঐ পাষণ্ড পিলিয়কে আমি ধনসম্ভোগ করতে দেব না। মহাপ্রেত অগাধ সম্পত্তি ভোগ করলে রাজ্যের অমঙ্গল হবে। আর, ওর সব সম্পত্তি পুণ্যকর্মে ও দুঃখিজনগণের প্রতিপালনে ব্যয় করব। আপনি যে-অবস্থায় থাকবেন পিলিয়কেও সেই অবস্থাতেই রাখব।''

এই বলিয়া ব্রহ্মদত্ত অমাত্যগণকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন—আর যে ভৃত্যগণ শঙ্খকে আশ্রয় দিয়াছিল তাহাদিগকে প্রচুর ধনরত্ন দান করিলেন।

বোধিসত্ত্ব একবার নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। সেজন্মে তাঁহার নাম ছিল ভূরিদত্ত। নাগপুরীর ঐশ্বর্য-বিলাসের মধ্যে তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি পোষধ ব্রত পালন করিয়া নির্বাণপথে আগাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। নাগপুরীর মধ্যে তপজপ ও ধ্যানধারণার অসুবিধা বিবেচনা করিয়া তিনি নরলোকে যমুনাতীরে এক উইয়ের ঢিপির মধ্যে কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া থাকিতেন। মাঝে মাঝে মায়ের চরণ-দর্শনের জন্য নাগভবনে যাইতেন।

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ মৃগবধ করিতে এই যমুনাতীরে আসিত। একদিন কোন মৃগ না পাইয়া ব্রাহ্মণকে উইয়ের ঢিপির কাছে বটবৃক্ষের শাখায় রাত কাটাইতে হইল। ব্রাহ্মণ খালি হাতে বাড়ী ফিরিবে না, পরদিন মৃগয়ার জন্য বটবৃক্ষে অপেক্ষা করিতে লাগিল। ভূরিদত্ত ব্রাহ্মণের দুঃখে বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

ব্রাহ্মণের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। তখন তিনি দিব্যমূর্তি ধরিয়া ব্রাহ্মণকে দেখা দিয়া বলিলেন—"ব্রাহ্মণ, তুমি বড়

দুঃখী, আমি তোমাকে এমন রাজ্যে নিয়ে যেতে পারি, যেখানে দুঃখের নামগন্ধও নাই। প্রচুর ঐশ্বর্য তুমি ভোগ করতে পাবে—যে-কোন কাম্য দ্রব্য চাইবে, তা-ই পাবে।

ব্রাহ্মণ ভূরিদত্তের প্রস্তাবে রাজী হইল। ভূরিদত্ত ব্রাহ্মণকে লইয়া গিয়া রাজভবনে স্থান দিলেন, বহু কিঙ্কর-কিঙ্করী তাহার সেবা করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ রাজার উপযুক্ত বেশভূষা, যানবাহন, শয্যা, আসন ইত্যাদির অধিকারী হইল। যে-সব সুখাদ্য ব্রাহ্মণ জীবনে চোখেও দেখে নাই, ভৃত্যগণ সর্বদাই তাহার আহারের জন্য তাহা আনিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ ভাবিতে লাগিল—সারা জীবন ত' জীবহিংসা করিলাম, পুণ্য করিলাম কবে? কোন্ পুণ্যে এমন ইন্দ্রত্ব লাভ হইল? কয়দিন এই ইন্দ্রত্ব বজায় থাকিবে, কে জানে? পুণ্য না করিয়াই এমন সুখ-ঐশ্বর্য পাইলাম। না জানি তপ-জপ করিলে—পুণ্য আহরণ করিলে কি না পাইব! অপরিসীম বিলাসভোগের মধ্যে ব্রাহ্মণের মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

এমন সময় একদিন ভূরিদত্ত আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্রাহ্মণ, কেমন আছ? বেশ সুখে আছ ত'?"

ব্রাহ্মণ বলিল—"দেব, আপনি ত' এ-পুরীর রাজপুত্র। আপনি এ-সমস্ত ত্যাগ করে যমুনার তীরে একটা উইয়ের ঢিপিতে সারাদিন পড়ে থাকেন কেন? আপনি কি চান? এর চেয়ে কাম্য জীবন কি আছে? কোন্ কাম্যের জন্য আপনি এত দুঃখ স্বীকার করেন?"

ভূরিদত্ত বলিলেন—"ব্রাহ্মণ, কেন এই সুখ-সৌভাগ্য ত্যাগ করে আমি দুঃখব্রত গ্রহণ করেছি, তা তুমি বুঝবে না। তোমার ভোগ-তৃষ্ণার অবধি নাই। কিছুকাল ভোগ কর, তার পর শুনবে তুমি যা ভোগ করছ, তা কেন আমি হেলায় ত্যাগ করেছি!"

ব্রাহ্মণ বলিল—"না দেব, আমি এখনই শুনব।"

ভূরিদত্ত বলিলেন—"দেখ, ভোগ্যবস্তুমাত্রই অনিত্য—সবই স্বপ্নবৎ—আজ আছে, কাল নেই। কয়দিনের এই সুখভোগ? তারপর, কয়দিন ভোগ করবার ক্ষমতা আমাদের থাকে? কোন সুখে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তাতে আর সুখ থাকে না। নিত্য যদি অমৃত খাও, সে অমৃতও ভাত-ডালের মত হয়ে যায়। কাজেই তা আর সুখ দেয় না। তারপর দেখ, যৌবন ত' বেশী দিন থাকে না—জরা এসে দেহ আক্রমণ করে। তখন ভোগ্য দ্রব্যের প্রাচুর্য থাকলেও ভোগ করবার শক্তি থাকে না। সে এক মহাশাস্তি—সামনে ভোগ্যবস্তু থরে থরে সাজানো—লালসা তেমনি রয়েছে—অথচ ভোগ করবার শক্তি নেই। তার উপর মৃত্যু অনিবার্য, মৃত্যুকালে সবই ফেলে যেতে হয়—কিছুই সঙ্গে যায় না। যার যত সুখ-সৌভাগ্য ছেড়ে যেতে হয়, তার ততই মৃত্যুযন্ত্রণা। ভোগসুখ নির্বাণের পথে আগাতে দেয় না—অনেক জন্ম পিছিয়ে নিয়ে যায়। এই সব ভেবে, আমি দেহের কথা না ভেবে দেহমুক্তির কথা ভাবি। তাই এই পোষধ ব্রত গ্রহণ করে থাকি। যাক্, তোমার এসব শোনবার দরকার নেই। তুমি প্রাণ ভরে ভোগ কর।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"আমি সব বুঝেছি। যে-মহাধনের জন্য নাগলোকের সমস্ত ঐশ্বর্য আপনি ত্যাগ করেছেন, আমি সে-মহাধনের জন্য আপনারই অনুসরণ করব।"

ভূরিদত্ত বলিলেন,—"তোমার এ সাময়িক বৈরাগ্য। ও-সব সংকল্প ত্যাগ কর। তোমার স্ত্রীপুত্রের জন্য যদি তোমার মন আকুল হয়ে থাকে,—তবে হয় তাদের তোমার কাছে আনিয়ে দিচ্ছি, নয় ত' সর্বকামদ মণি দিচ্ছি। এই মণি নিয়ে তুমি নিজের গৃহে ফিরে যাও। এই মণি তোমার কাছে থাকলে তুমি যা চাইবে, তাই পাবে! নরলোকেও তুমি রাজার মতই থাকতে পারবে।"

ব্রাহ্মণ বলিল—"না প্রভু, আমার মণিতে কাজ নেই—নাগলোকের ঐশ্বর্যে কাজ নেই—নরলোকের ঐশ্বর্যে কাজ নেই—স্ত্রীপুত্রেও কাজ নেই। আমি বুঝতে পেরেছি সবই অনিত্য—সবই মায়া। আমি কোন পুণ্য করিনি, তবু আপনার কৃপা লাভ করলাম। পুণ্যাচরণ করলে না জানি কি দৈব সম্পদই পাব! যে-মহাসম্পদের জন্যে আপনি রাজ-

সম্পদ ত্যাগ করেছেন, সে-মহাসম্পদের জন্যে আমিও পোষধ ব্রত গ্রহণ করব। আমাকে দীক্ষা দিন।"

ভূরিদত্ত ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"তোমাকে এক বৎসর ভাববার সময় দিলাম। এই নাও সর্বকামদ মণি। এটা নিয়ে তুমি নরলোকে স্ত্রীপুত্রদের কাছে ফিরে যাও। এক বৎসর পরেও যদি তোমার এই মতি থাকে, তবে তোমাকে দীক্ষা দেব।"

ব্রাহ্মণ সর্বকামদ মণি সমুদ্রের গভীর জলে নিক্ষেপ করিয়া ভূরিদত্তের পদতলে পড়িয়া পোষধ ব্রতের দীক্ষা প্রার্থনা করিল।

ভূরিদত্ত তখন ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া যমুনাতীরে ফিরিয়া গেলেন।

যার যা খাদ্য

কাশীর রাজা ব্রহ্মদত্ত একবার পুরোহিতকে সঙ্গে করিয়া ছদ্মবেশে রাজ্যের প্রজাদের অবস্থা নিজের চোখে দেখিয়া বেড়াইতেছিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে এক গ্রামে এক জমিদারের বাড়িতে আসিয়া উঠিলেন। জমিদার রাজাকে চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু চেহারা দেখিয়া বুঝিলেন কোন রাজপরিবারের লোক কিংবা কোন ধনী ব্যক্তি হইবেন। জমিদার খুব আদর করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। তখন বেলা দুপুর হইয়া গিয়াছে। রাজা স্নান করিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। জমিদার তখন একটা থালায় করিয়া অনেক রাজভোগ্য খাবার লইয়া আসিয়া রাজাকে দিলেন, আর পুরোহিতকে বলিলেন—"আপনি আমার দেবালয়ে গিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করুন।"

রাজা সে খাদ্য নিজে না খাইয়া পুরোহিতকে দিলেন। পুরোহিত দেখিলেন—জমিদার বাড়ির দরজায় একজন তাপস বসিয়া আছেন। তিনি সেই থালাটি লইয়া গিয়া তাপসের হাতে দিলেন।

তাপস থালাটি হাতে লইয়া পথের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন—একজন বৌদ্ধভিক্ষু যাইতেছেন। তাপস ঐ বৌদ্ধভিক্ষুকে ডাকিয়া থালাটি দিয়া বলিলেন—"আপনি খান।"

বৌদ্ধভিক্ষু জমিদারের বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলেন—রাজা বসিয়া আছেন। ভিক্ষু সেই খাদ্যের থালা রাজার সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন—"আপনি খান।"

ব্যাপার দেখিয়া জমিদার তো অবাক! জমিদার খাইতে দিলেন রাজাকে—সেই খাদ্য তিন হাত ঘুরিয়া আবার তাঁহার কাছেই আসিল। জমিদার রাজাকে শুধাইলেন—"আপনি নিজে না খেয়ে ব্রাহ্মণকে দিলেন কেন?"

রাজা বলিলেন—"আমি দানের পাত্র নই—এই ব্রাহ্মণ জ্ঞানী, পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ, সদাচারী ব্যক্তি। ইনি উপস্থিত থাকাতে আমি আপনার খাদ্য কি করে ভোজন করি? আপনার খাদ্য এতই দামী যে, এ খাদ্য ব্রাহ্মণকে দান করলে পুণ্য হবে ভেবে আমি এঁকে দিয়েছিলাম।"

জমিদার পুরোহিতকে শুধাইলেন—"আপনি আহার করলেন না কেন?"

পুরোহিত বলিলেন—"আমি ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি অনেক, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান আমার হয়নি। আমি সংসারী, আমার ছেলেপুলে ও স্ত্রী আছে। আমি রাজসেবা করি। ভোগসুখে আমার লোভ আছে। কিন্তু ঐ তাপস সংসার ত্যাগ করেছেন—প্রকৃত জ্ঞান-লাভ করেছেন, ইনি নির্লোভ নিষ্পাপ ব্যক্তি। নিজে কখনও আহারের আয়োজন করেন না—যেখানে যা পান, তা-ই খান। ওঁকে দান করলে পুণ্য হবে বলে আমি নিজে না খেয়ে ওঁকে দিয়েছি।"

জমিদার তাপসকে শুধাইলেন—"আপনি কেন আহার করলেন না?"

তাপস বলিলেন—"দেখুন, সংসার ত্যাগ করেছি। কিন্তু আমারও একটা কুটীর আছে—বনে বনে ফল-মূলের সন্ধান করি, লোকালয়ে এসে দু'মুঠো চাল পেলে তা নিয়ে গিয়ে ফুটিয়ে খাই।

হরিণের চামড়া পেতে শুই, ঘরে জলের কলসী রাখি, একটা প্রদীপও জ্বালি। আহার না জুটলে উদ্বিগ্ন হই। আমি মুক্তপুরুষ নই। আর এই ভিক্ষুর ঘর নেই, বিছানা নেই, খাওয়ার কোন সংস্থান নেই। যেখানে রাত্রি গভীর হয়, সেইখানে মাটিতে শয়ন করেন—ক্ষুধা পেলে গৃহস্থের দ্বারে ভগবান বুদ্ধের নাম করে এসে দাঁড়ান—কিছু পান তো খান, না পেলে উপবাসী থাকেন। তৃষ্ণা পেলে পুকুরে নেমে জল খান—একটু নেকড়া পরে লজ্জা নিবারণ করেন। ইনিই মুক্তপুরুষ। এঁকে দান করলেই পুণ্য হয়। সেজন্য ও খাদ্য এঁকেই দিলাম।''

জমিদার ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—''আপনার দেহ জীর্ণ-শীর্ণ, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি বড়ই ক্ষুধার্ত—হয়ত দু'দিন উপবাসী আছেন। তবু আপনি এই সুখাদ্য পেয়েও তা আমার মান্য অতিথিকে দান করলেন কেন?''

ভিক্ষু বলিলেন—''দেখুন, আমি ক্ষুধার্ত। দু'দিন থেকে উপ-বাসী আছি—একথা সত্য। কিন্তু যে খাদ্য আমার জুটল, তা রাজার খাদ্য, ভিক্ষুর খাদ্য নয়। এরকম খাদ্য খেলে ভিক্ষুর ধর্মহানি হয়। এ খাদ্য রাজা বা ধনী শ্রেণীর উপযুক্ত, তাই আমি ঐ ধনী ব্যক্তিকেই দান করলাম। দান করতে হলে যার যা যোগ্য তাকে তা-ই দিতে হয়! দরিদ্রকে হাতী দান করতে নেই—কুকুরকে পায়স-পিষ্টক খেতে দিতে নেই—সন্ন্যাসীকে শাল দিতে নেই।''

জমিদার তখন পুরোহিতকে ডাকিয়া খাইতে দিলেন আতপ চাউলের অন্ন, নিরামিষ ব্যঞ্জন, দুগ্ধ, দধি ও মিষ্টান্ন। তাপসকে দিলেন ফল ও আটা এবং ভিক্ষুককে দিলেন ভুট্টার রুটি, গুড় ও মাটির ভাঁড়ে জল। রাজা তাঁহার রূপার থালায় নানাবিধ সুখাদ্য আহার করিলেন। সকলেই তৃপ্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

মনোজ-জাতক
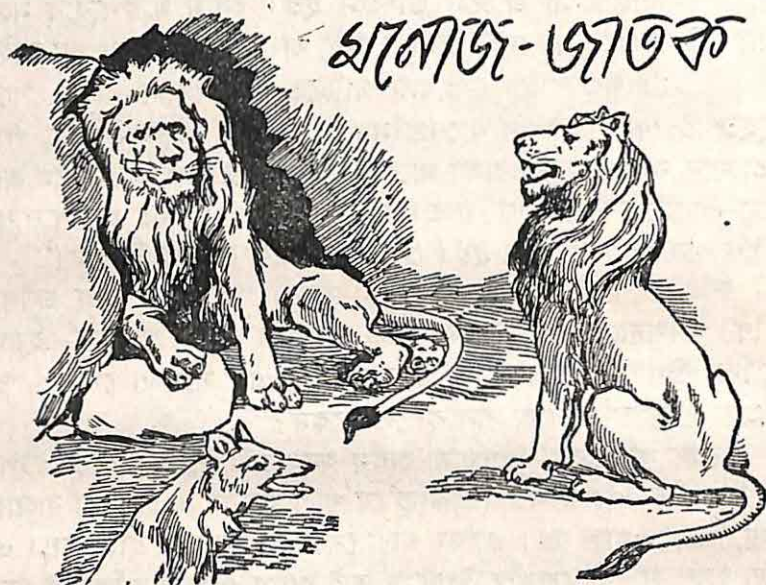
পূর্বকালে বোধিসত্ত্ব একবার সিংহরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার এক পুত্র ও কন্যা ছিল। পুত্রটির নাম মনোজ। মনোজ বড়ই পিতৃভক্ত ছিল। সে বন্য মহিষাদি বধ করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিত। এই পরিবারের কোন দুঃখকষ্ট ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়—অশান্তি, অস্বস্তি বা বিপদ বাহির হইতেই আসে।

মনোজ একদিন শিকারে বাহির হইয়া দেখিল, একটি শৃগাল তাহার পথের পাশে দাঁড়াইয়া তাহাকে প্রণাম জানাইতেছে। মনোজ বলিল—"বৎস, তুমি কি চাও?"

শৃগাল বলিল—"ধর্মাবতার, আমি আপনার সেবা করিতে চাই।"

মনোজ বলিল—"বেশ, আজ হতে তুমি আমার পার্শ্বচর হলে।"

মনোজ শৃগালকে সঙ্গে করিয়া বাসগুহায় আসিলে বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন—"সঙ্গে ও কে, বাবা?"

মনোজ বলিল—"ও একটি শৃগাল, আমি ওকে ভৃত্য ক'রে এনেছি।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন—"ভাল করলে না বাবা। তোমার ভৃত্যের ত' কোন প্রয়োজন নেই। একটা বাইরের জীবকে আমাদের শান্তিময় সংসারে ঠাঁই দেওয়া ভাল হ'ল না।"

মনোজ বলিল—"কিছু ভয় নেই, বাবা। শৃগাল একটা দুর্বল ক্ষীণজীবী প্রাণী। আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন—"জীব যত ক্ষুদ্রই হোক, তা থেকে অনিষ্ট খুবই হতে পারে। ক্ষুদ্র বলে উপেক্ষা করো না। ওটাকে দূর করে দাও।"

শৃগালের তোষামোদে মনোজ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। মনোজ এই উপদেশ শুনিল না। বোধিসত্ত্ব শুধু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব হইলেন। সিংহীকে বলিলেন—"প্রিয়ে, আজ থেকে আমাদের সর্বনাশের সূত্রপাত হ'ল।"

এখন হইতে মনোজ শিকারে বাহির হইলে শৃগাল সঙ্গে সঙ্গে যাইত। একদিন শৃগাল বলিল—"ধর্মাবতার, অশ্বের মাংস বড়ই মিষ্ট। আপনি অশ্ব শিকার করুন।"

মনোজ—"অশ্ব কোথায় পাব? এ বনে ত' অশ্ব নেই।"

শৃগাল—"আমি আপনাকে অশ্ব দেখাতে পারি।"

এই বলিয়া শৃগাল মনোজকে নদীর ধারে লইয়া গেল। সেখানে রাজার অশ্ব চরিত। মনোজ একটি অশ্বকে বধ করিয়া বাসগুহায় লইয়া আসিল।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন—"বৎস, অশ্ব কোথায় পেলে? এ বনে ত' অশ্ব নেই!"

মনোজ বলিল—"রাজার অশ্ব নদীর তীরে চরছিল, আমি ধরে

এনেছি। মহিষমাংস খেয়ে খেয়ে অরুচি হয়ে গেছে, সেজন্য অশ্ব মেরে আনলাম।''

বোধিসত্ত্ব—অমন কাজ আর করো না, বাবা। অশ্ব রাজাদের বড়ই প্রিয়, তাঁহাদের বাহন। অশ্ব বধ করলে তাঁরা সহজে ছাড়বেন না। তোমাকে যে-কোন উপায়েই হোক বধ করবেন।

মনোজ বলিল—ভাববেন না, বাবা, আমার কেউ কিছু করতে পারবে না। মানুষের কাছ থেকে আমার কোন ভয় নেই। তা ছাড়া, আমার ভৃত্য শৃগাল বড়ই বুদ্ধিমান ও ধূর্ত। সে সব সময়ে পাহারা দেয়। আমাকে সাবধান করে দেবে।''

সিংহ অশ্ব ধরিয়া লইয়া গিয়াছে শুনিয়া রাজা অশ্বগণকে নগরের মধ্যেই রাখিয়া দিলেন। রাত্রিকালে নগরে প্রবেশ করিয়া মনোজ অশ্ব ধরিয়া আনিতে লাগিল। তখন রাজা অশ্বশালা নির্মাণ করিয়া খুব উঁচু প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া একটি বাগানের মধ্যে অশ্বদের রক্ষা করিতে লাগিলেন। মনোজ সেই প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া অশ্ব ধরিয়া আনিতে লাগিল। প্রত্যেকবারই শৃগাল পথ দেখাইয়া লইয়া যাইত। রাজা তখন বিরক্ত হইয়া অশ্বরক্ষার জন্য একজন ধনুর্ধর নিয়োগ করিলেন। ধনুর্ধর একটি আম্রবৃক্ষে বসিয়া থাকিল। মনোজ যেমন একটি অশ্ব লইয়া প্রাচীর পার হইতে যাইবে, অমনি ধনুর্ধর তাহাকে অব্যর্থ সন্ধানে বিদ্ধ করিল। তাহার শর ছিল বিষাক্ত। মনোজ বিদ্ধ-শর লইয়াই ছুটিয়া বাসগুহায় পিতার নিকট উপস্থিত হইল। মনোজ ধনুর্বাণের খোঁজ রাখিত, কিন্তু, বিষের সন্ধান জানিত না। ধনুর্বাণকে সে গ্রাহ্য করিত না।

মনোজ সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে বোধিসত্ত্ব বলিলেন—''বৎস, শৃগালটা এখন কোথা?''

মনোজ—সে পালিয়েছে।

বোধিসত্ত্ব—নিশ্চয়ই তা-ই। যতক্ষণ তুমি সুস্থ সবল ছিলে, ততক্ষণ সে তোমার বন্ধু ছিল, কিন্তু এখন আর সে কেউ নয়। বার-বারই নিষেধ করেছিলাম। বৃদ্ধ অশক্ত হয়ে পড়েছি, নিষেধ ছাড়া আর কি করতে পারি?

বোধিসত্ত্ব শরটি মুক্ত করিলেন। কিন্তু শরটি বিষাক্ত ছিল— মনোজকে বাঁচাইতে পারিলেন না।

সে অনুতাপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। বোধিসত্ত্ব আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"অধমের সহিত মিত্রতার ফল এইরূপই হয়। আমার এমন পিতৃভক্ত পুত্র একটা ধূর্তের প্ররোচনায় ও লোভের বশবর্তী হয়ে প্রাণ হারাল।"

মৃণাল-জাতক

ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব কাশীধামে একজন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্বের ছয় ভাই ও এক ভগিনী ছিল। বোধিসত্ত্বের নাম ছিল মহাকাঞ্চনকুমার। ইনি তক্ষ-শীলা হইতে সর্ববিদ্যা-বিশারদ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া ভগিনী ও ভ্রাতৃগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

মাতাপিতা বৃদ্ধ হইয়া বিষয়কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে চাহিলেন। তাঁহারা বোধিসত্ত্বকে বলিলেন—"বৎস, এই বার বিয়ে ক'রে সংসারী হও।"

নাম কাঞ্চনকুমার হইলে কি হইবে—কাঞ্চনে তাঁহার স্পৃহা ছিল না। তিনি বলিলেন—"আমি বিয়ে ত' করবই না, সংসারীও হব না।"

মাতাপিতা অনেক চেষ্টা করিয়াও কাঞ্চনকুমারকে সংসারী করিতে পারিলেন না। তখন তিনি অন্যান্য পুত্রের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন এবং তাহাদিগকে সংসারের ভার লইতে বলিলেন।

কিন্তু সকলের মুখেই এক কথা। এমন কি, কন্যাও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে চাহিলেন।

তারপর একদিন মাতাপিতার মৃত্যুর পর কাঞ্চনকুমার সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া ছয় ভাই, কাঞ্চনী নাম্নী ভগিনী, একটি দাস, একটি দাসী ও একজন সখাকে সঙ্গে লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা হিমবন্ত প্রদেশে কুটীর বাঁধিয়া তপস্যায় মন দিলেন। সকলে বনে গিয়া ফলমূল সংগ্রহ করিয়া আনিতেন,—তাহাই তাঁহাদের একমাত্র ভক্ষ হইল। কিছুদিন পর কাঞ্চনকুমার দেখিলেন—ফলমূল-সংগ্রহে ভ্রাতাদের বড়ই উৎসাহ এবং তাহারা বনে বনে ঘুরিয়া এত ফলমূল সংগ্রহ করে যে, মনে হয় যেন আশ্রমে একটি হাট বসিয়া গিয়াছে। এই-সকল ফলমূল সংগ্রহ করিতেও তাহাদের অনেক সময় অতিবাহিত হয়। তখন তিনি নিয়ম করিলেন—প্রতিদিন একজন মাত্র ফল-সংগ্রহে যাইবে। সে যাহা সংগ্রহ করিবে, তাহাই সকলকে ভাগ করিয়া খাইতে হইবে।

কিছুদিন পরে আচার্য কাঞ্চন দেখিলেন, সকলে একত্র থাকার ফলে যতটা গল্পগুজব, বাদানুবাদ ও তর্কবিচার হয়—ততটা শীল-সাধনা হয় না। তখন তিনি প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন কুটিরে থাকিবার জন্য আদেশ দিলেন এবং বলিয়া দিলেন—ঘণ্টাধ্বনির দ্বারা সংকেত দিলেই সকলে একত্রে মিলিত হইবেন, নতুবা প্রত্যেককেই একাকী থাকিতে হইবে। যিনি ফলমূল সংগ্রহ করিবেন, তিনি একটি পাষাণফলকে তাহা দশটি ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়া আপনার ভাগ লইয়া চলিয়া যাইবেন। অন্যান্য সকলে পরে আপন আপন ভাগ লইয়া আসিবেন।

সকল ঋতুতে ফল পাওয়া যায় না। যে সময় ফল জুটিত না, সে সময় ইঁহারা মৃণালকন্দ ভক্ষণ করিতেন। ইঁহাদের তপস্যায় স্বর্গে শক্রের আসন উত্তপ্ত হইল। শক্র ভাবিলেন, ইঁহারা বোধ হয় শক্রত্বলাভের জন্য এই দুস্তর তপস্যা করিতেছেন। তিনি তাই ছলনা করিবার জন্য কাঞ্চনকুমারের মৃণাল হরণ করিলেন।

কাঞ্চনকুমার সে দিন নিজের ভাগ না পাইয়া নীরবে উপবাস

করিয়া রহিলেন। পরদিনও শক্র ঐরূপে মৃণাল হরণ করিলেন। সেদিনও কাঞ্চনকুমার নীরবে অনশনে রাত্রি কাটাইলেন,—পরদিনও তিনি মৃণাল পাইলেন না।

তখন তিনি ভাবিলেন, দশজনের মধ্যে একজন কেহ দুই ভাগ গ্রহণ করিতেছে—তাহার বোধ হয় ক্ষুধানিবৃত্তি হইতেছে না। এই ভাবিয়া তিনি ঘণ্টাধ্বনি করিয়া সংকেত দিলেন। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যাকালে সকলে একত্র মিলিত হইলেন। কাঞ্চনকুমার বলিলেন—"আমি তিনদিন মৃণাল পাইনি, এ তিনদিন উপবাসে আছি। তোমরা হয় আমার জন্য মৃণাল রাখনি, নয়ত কেউ আমার ভাগ অপহরণ করেছ।"

ভ্রাতৃগণ বলিলেন—"আপনার অংশ অগ্রে রাখা হয়। আপনার জন্য আমরা জীবন দিতে পারি। আপনাকে উপবাসী রেখে কি আমরা আপনার অংশ গ্রহণ করতে পারি?

তখন ভ্রাতৃগণ একে একে শপথ করিতে লাগিলেন। স্বয়ং শক্র সেখানে প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত হইয়া ইঁহাদের চরিত্র পরীক্ষা করিতেছিলেন।

১ম ভ্রাতা—আচার্য, যে আপনার মৃণাল হরণ করেছে, সে পাপিষ্ঠ ধনসম্পদ, দাসদাসী ও স্ত্রীপুত্র নিয়ে যেন সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করে।

২য় ভ্রাতা—আচার্য, যে পাষণ্ড আপনার মৃণাল হরণ করেছে, তার যেন তীব্র বিষয়বাসনা জন্মে ও বিলাসদ্রব্যে তার আসক্তি হয়।

৩য় ভ্রাতা—আচার্য, যে পাপাত্মা আপনার মৃণাল হরণ করেছে. ধনধান্যে, পুত্রকন্যায় ও সংসারসুখে মগ্ন থেকে, তার আয়ু যে ফুরিয়ে আসছে, একথা যেন সে ভুলে যায়।

৪র্থ ভ্রাতা—আচার্য, যে আপনার মৃণাল হরণ করেছে, সে যেন রাজা হয়ে রাজ্যশাসনের ক্লেশ ভোগ করে।

৫ম ভ্রাতা—আচার্য, যে আপনার মৃণাল হরণ করেছে, সে যেন বিষয়াসক্ত লোভী ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

৬ষ্ঠ ভ্রাতা—আচার্য, যে আপনার মৃণাল হরণ করেছে, সে যেন

বেদবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে যাগযজ্ঞে, ধনসম্পদ্ ও দানদক্ষিণা নিয়ে জীবন ব্যর্থ করে।

বন্ধু,—আচার্য, যে আপনার মৃণাল হরণ করেছে, সে যেন গ্রামীণ হয়ে মিথ্যা অহঙ্কারে ও নৃত্য, গীত, উৎসব ইত্যাদিতে মত্ত থেকে পরলোকের কথা ভুলে যায়।

ভগিনী—আচার্য, যে আপনার মৃণাল হরণ করেছে, সে যেন কোন রাজার ষোড়শসহস্র মহিষীর মধ্যে অগ্রমহিষী হয়ে পরকাল ধ্বংস করে।

দাসী—আচার্য, যে দুরাত্মা আপনার মৃণাল হরণ করেছে, সে যেন আত্মগর্বে নির্লজ্জ হয়ে সকলকে বঞ্চিত ক'রে নিজে সকল প্রকার সুখাদ্য ভোজন করে।

এই শপথ শুনিয়া কাঞ্চনকুমার তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"আমারও শপথ করার প্রয়োজন। আমি যে মৃণাল পাইনি, এ কথা যদি মিথ্যা হয়, তবে যেন আমি নির্বাণ লাভ ক'রে শক্রত্ব লাভ করি। এই পৃথিবীতে কেউ তপস্যা করলেই শক্রের আসন উত্তপ্ত হয়—আর শক্র মনে করে, বুঝি তার সিংহাসন কেড়ে নেবার জন্যে সকলে তপস্যা করছে। এজন্য শক্র একদিনও স্বস্তি বা আনন্দ পায় না, সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে। আমি যদি মিথ্যা বলে থাকি, তবে শক্রের মতো দুর্বল জীবন যেন আমাকে বহন করতে হয়।

শক্র তখন বুঝিলেন—ইহারা যে শপথ করিল, তাহাতে কোন ভোগ্যবস্তুর প্রতি ইহাদের মমতা নাই, ভোগ্যবস্তুকে ইহারা গলিত শবের মত ঘৃণা করে, ভোগাসক্তকে কৃমিকীটের ন্যায় জ্ঞান করে। ইন্দ্রপদকে ইহারা সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করে। ইন্দ্রত্বলাভকে ইহারা চরম দণ্ড মনে করে।

শক্র তখন দেহ ধারণ করিয়া কাঞ্চনকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"ভদন্ত, আমি শক্র, আমিই আপনার মৃণাল হরণ করে-ছিলাম। এই নিন আপনার মৃণাল।"

কাঞ্চনকুমার শক্রকে দেখিয়া একটুও বিচলিত হইলেন না। তিনি ধীর-প্রশান্তকণ্ঠে বলিলেন—"শক্র, তুমি স্বর্গের অধিপতি হও, আর

ত্রিভুবনেশ্বরই হও—আর তোমার ক্ষমতা যত অসীমই হোক্, তোমার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তোমার কাছে আমাদের প্রার্থনীয় কিছুই নেই—তোমাকে উপাসনা করবার বা তোমাকে ভয় করবার আমাদের কোন কারণই নেই। আমি জিজ্ঞাসা করি, আমরা তোমার বন্ধু নই—তোমার উপহাসের পাত্র নই—আমরা ভাট নই—নট নই—পাগল নই, তবে কেন আমাদের সঙ্গে তুমি পরিহাস করলে?"

শক্র লজ্জিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। শ্রমণগণের কোন ক্রোধ নাই—তাঁহারা তখনই তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।

বোধিসত্ত্ব এক জন্মে তক্ষশিলার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার পাপক নামে এক ছাত্র ছিল। ছাত্রটি নিজের নামের জন্য বড় লজ্জিত থাকিত। সহপাঠীরাও এজন্য তাহাকে গঞ্জনা দিত। পাপক গুরুর নিকটে গিয়া প্রার্থনা করিল—"আর্য! আমার নামটি বদলে দিন—এ নামে আমি বড় লজ্জা পাচ্ছি।"

গুরু বলিলেন—"তুমি জনপদে ভ্রমণ করে যে-সকল নাম শুনতে পাবে, তাদের মধ্যে যেটা পছন্দ হয়, সেটা আমাকে জানাও, আমি তোমার সেইমত নামকরণ করে দেব।" পাপক জনপদে ভ্রমণে বাহির হইল; যাহাকে দেখে, তাহারই নাম জিজ্ঞাসা করে; কেহ বলে, কেহ বলে না।

কতকগুলি লোক একটি বালকের মৃতদেহ দাহস্থানে লইয়া যাইতেছে। পাপক মৃত বালকটির নাম জিজ্ঞাসা করিল। তাহার নাম 'জীবক'। নাম শুনিয়া পাপক ভাবিল—"এ কি! জীবকও অকালে মরে!" পাপক কিছু দূর গিয়া দেখিল, একটি দাসীকে তাহার প্রতিপালক প্রহার করিতেছে, অপরাধ—সে হাটে পণ্যদ্রব্য

লইয়া গিয়া কিছুই লাভ করিয়া আসিতে পারে নাই। পাপক তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—তাহার নাম 'লক্ষ্মী'। পাপক ভাবিল, যাহার নাম লক্ষ্মী, তাহার এই দশা! কিয়দ্দূর গিয়া একটি লোকের সঙ্গে পাপকের দেখা হইল। সে পাপককে পথের হদিশ জিজ্ঞাসা করিল এবং বলিল, "আমি পথ হারিয়েছি।" পাপক তাহাকে পথের সন্ধান দিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল—"আমার নাম 'পন্থক'।"

পাপক ভাবিতে ভাবিতে চলিল—যাহার নাম পন্থক, সে-ও পথ হারায়! ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া পাপক একটি গৃহস্থের কুটীরে উপস্থিত হইয়া পানের জন্য জল চাহিল। সে একটি কালো কুচকুচে ছেলেকে ডাকিয়া বলিল—"হেমাঙ্গ, একপাত্র জল আনো।" পাপক বলিল—"এত কালো ছেলের নাম 'হেমাঙ্গ'?"

গৃহস্থ বলিলেন—"বলেন কেন ম'শায়—ছেলেটির বর্ণ গৌরই ছিল—রোগে কালো হয়ে গেছে। আর দেখুন না, এই ছেলেটির সাধ করে নাম রেখেছিলাম 'কমলাক্ষ'! বসন্ত রোগে ও হয়ে গেল কানা। আর ঐ দুর্বল ছেলেটি দেখছেন, ওর নাম রেখেছিলাম 'বলভদ্র', ও বেচারা চিররুগ্ণ হয়ে থাকল। আমি যখন ছেলেদের নাম রাখি, তখন বিধাতা অন্তরালে থেকে ক্রূর হাসি হাসেন।"

পাপকের জনপদভ্রমণ শেষ হইল। সে গুরুর কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"আমার নাম বদলাবার দরকার নেই। আর্য, যে জগতে জীবক অকালে মরে, লক্ষ্মী পেটের দায়ে মার খায়, পন্থক পথ হারায়, বলভদ্রের চলতে-ফিরতে কষ্ট হয়, কমলাক্ষ চোখে দেখতে পায় না এবং হেমাঙ্গের গায়ের রঙ কালো কুচকুচে, সে জগতে পাপক যে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে উঠতে পারে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বৎস, নাম কেবল পদার্থ চিনবার সঙ্কেত মাত্র, নামে কেউ বড় হয় না। সাধনাই বড়। বিনা সাধনায় উৎকৃষ্ট নাম হয় বিড়ম্বনা বা উপহাস। সাধনা থাকলে অপকৃষ্ট নামও প্রাতঃস্মরণীয় হতে পারে।"

মহাজনক জাতক

মিথিলায় এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল অরিষ্টজনক। এই রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পোপজনক ছিলেন উপরাজ। দুই ভাইয়ের মধ্যে বেশ প্রীতি ছিল। কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতির লোক অরিষ্ট-জনককে বুঝাইতে চেষ্টা করিল—পোপজনক তাঁহাকে বধ করিয়া রাজ্য-অধিকারের চেষ্টা করিতেছে। প্রথম প্রথম রাজা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। কিন্তু রাজাদের মন চিরদিন সংশয়ী মনই হয়। অনবরত এক কথা শুনিতে শুনিতে রাজার ধারণা হইল—তাঁহার ভাই তাঁহার শত্রু। রাজা পোপজনককে বন্দী করিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কিছুকাল পরে পোপজনক কারাগার হইতে পলাইয়া গেলেন। তারপর পোপজনক প্রজাদের মধ্যে নিজের প্রতি অবিচারের কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে বহুলোক পোপের সহায় হইয়া

উঠিল। এইভাবে পোপজনক নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে লইয়া একটা বাহিনী গড়িয়া তুলিলেন। তারপর একদিন তিনি মিথিলা আক্রমণ করিলেন। অরিষ্টজনক যুদ্ধ করিবার জন্য নগর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। যুদ্ধে অরিষ্টজনকের মৃত্যু হইল। পোপজনক রাজ্য অধিকার করিলেন। অরিষ্টজনকের মহিষী ছিলেন গর্ভবতী। রাজার মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র মহিষী ধনরত্ন লইয়া একাকিনী ছদ্ম-বেশে নগর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। কিছুদূর পায়ে হাঁটিয়া আগাইয়া গেলেন। তারপর একখানি গরুর গাড়ী পাইয়া তাহাতে চড়িয়া তিনি চম্পকনগরে আসিয়া পেীঁছিলেন। চম্পকনগরে এক ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের গৃহে তিনি ঠাঁই পাইলেন। এখানে তিনি একটি পুত্র প্রসব করিলেন। স্বয়ং বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। পুত্রের নাম হইল মহাজনক।

মহাজনক ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে পালিত হইতে লাগিলেন। বড় হইয়া তিনি শুনিলেন, তিনি রাজপুত্র ; তাঁহার পিতৃব্য তাঁহার পিতাকে হত্যা করিয়া রাজ্য দখল করিয়াছেন। তাই তাঁহার মায়ের এই দশা। মহাজনক ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে খুব বিদ্বান হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার একমাত্র জপমন্ত্র হইল পিতৃরাজ্যের উদ্ধার। এজন্য চাই প্রচুর ধন, ধনের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইবে। মায়ের কাছে সম্বল যাহা ছিল, মহাজনক তাহা লইয়া সুমাত্রাদ্বীপে বাণিজ্য করিবার জন্য অন্যান্য বণিকের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। সমুদ্রে তাঁহার পোত ডুবিয়া গেল। মহাজনক কোন প্রকারে প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার সর্বস্ব গেল। সমুদ্রকূলে পেীঁছিয়া মহাজনক বহুদিন দেশে-দেশে পথে-পথে ঘুরিয়া একদিন মিথিলানগরে আসিলেন। মিথিলায় কাহাকেও তিনি চিনেন না—পথশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হইয়া কুমার মিথিলার উপকণ্ঠে এক আম্রকাননে আশ্রয় লইলেন। সেখানে এক গাছতলায় ধূলিশয্যায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

এদিকে পোপজনকের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পুত্র-সন্তান নাই —একটি কন্যা আছে, তাহার নাম সীবলী। সীবলীর সঙ্গে যাহার বিবাহ হইবে—সে-ই রাজা হইবে। কিন্তু সীবলীর কতকগুলি পণ

ছিল—সে-পণ যে রক্ষা করিতে পারিবে, সে-ই সীবলীকে পত্নীরূপে লাভ করিতে পারিবে—রাজার এই নির্দেশ ছিল। সীবলীকে বিবাহ করার জন্য রাজ্যের যত ধনী যুবক ও রাজকর্মচারী একে একে অগ্রসর হইল। কিন্তু কেহই একটি পণও রক্ষা করিতে পারিল না। তখন অমাত্যবর্গ স্থির করিল—রাজহস্তীকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হোক। সেই হস্তী রাজা নির্বাচন করিয়া আনুক। রাজহস্তীকে রাজানির্বাচনের জন্য পাঠানো হইল। রাজহস্তী নগরের উপকণ্ঠে আম-বাগানে যেখানে মহাজনক নিদ্রিত ছিলেন, সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। সে শুঁড় দিয়া কুমারকে জাগাইয়া তুলিল। তখন হস্তীর সংগী অমাত্যবর্গ কুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"উঠুন, চলুন, আপনার রাজ্যাভিষেক হবে। আপনি এ রাজ্যের রাজা নির্বাচিত হয়েছেন।"

মহাজনক ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। কিন্তু যখন তাঁহাকে হাতীর পিঠে চড়াইয়া রাজপুরীতে আনা হইল এবং যখন তিনি সব কথা শুনিলেন —তখন বুঝিতে পারিলেন, তিনি তাঁহার পিতৃরাজ্য ফিরিয়া পাইয়াছেন। তাঁহারই ত' রাজা হইবার কথা! তারপর তিনি সীবলীর পণগুলির সব দাবী পূরণ করিয়া সীবলীকে মহিষীরূপে লাভ করিলেন।

মহাজনক তারপর চম্পকনগরে রথ পাঠাইয়া নিজের জননীকে আনাইলেন। মাতৃভক্ত রাজা প্রত্যহ জননীর চরণ পূজা করিতেন এবং মায়ের আদেশ-মত রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। মহাজনক ছিলেন রাজর্ষি জনকের মতই জ্ঞানী ও প্রজাপালক। কিছুকাল রাজ্যপালনের পর তাঁহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাঁহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বোধিসত্ত্ব জাগিয়া উঠিল।

মহাজনকের জননীর মৃত্যু হইল। তাহাতে মহাজনক বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। একদিন চিত্তবিনোদনের জন্য তিনি উদ্যানভ্রমণে যাত্রা করিলেন। আমবাগানের মধ্য দিয়া যাইবার সময়ে তিনি লক্ষ্য করিলেন—একটি আমগাছে অজস্র ফল পাকিয়া আছে—ফলভারে বৃক্ষটি অবনত, আর একটি বৃক্ষে একটিও আম নাই। তিনি হাতীর

পিঠ হইতে নামিয়া প্রথম গাছটি হইতে একটি আম পাড়িয়া দেখিলেন, আমের স্বাদ অতি চমৎকার। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, ফিরিবার সময় পেট ভরিয়া আম খাইয়া যাইবেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি যখন ফিরিলেন—তখন সেই আমগাছটার চেহারা দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। গাছে একটিও আম ত' নাই-ই, একটি পাতাও নাই! ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, রাজা নিজে এতদিন ঐ গাছের আম প্রসাদী করেন নাই বলিয়া কেহই একটি আমও পাড়ে নাই। আজ রাজা যখন উহার একটি আম নিজে চাখিয়াছেন—তখন ঐ গাছের আম খাওয়ার বাধা থাকিল না। তাই নগরবাসীরা ঐ গাছের সমস্ত আমই খাইয়া ফেলিয়াছে এবং আম পাড়িতে গিয়া গাছটার শাখাপ্রশাখা সব ভাঙিয়া ফেলিয়াছে।

রাজা এই আমগাছটার দিকে একবার তাকাইলেন আর ফলহীন গাছটির দিকেও তাকাইলেন,—দেখিলেন ফলহীন বৃক্ষটি পল্লবঘন সৌন্দর্য লইয়া স্নিগ্ধ শীতল ছায়া বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া রাজার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, ফলে-ভরা আমগাছটির যে-দশা হইয়াছে, অতুল সম্পদের অধীশ্বর তাঁহারও দশা একদিন তেমনি হইবে। অকিঞ্চন আমগাছটির মত অকিঞ্চন সর্বত্যাগী সগৌরবে জীবলোককে করুণার ছায়া দান করিয়া চিরদিন বিরাজ করিবে।

মহাজনকের রাজ্য, ধন, সুখের সংসার, দারা, পুত্র—সবই স্বপ্ন—সবই বিষবৎ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। রাজা রাজপুরীতে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু সেদিন হইতে সমস্ত রাজভোগ বর্জন করিলেন। প্রাসাদের এক নিভৃত অংশে তিনি জীবের পরিণাম চিন্তা করিয়া কাটাইতে লাগিলেন। সেখানে রাণীদের প্রবেশ নিষেধ, দাসদাসীদের প্রবেশ নিষেধ, কেবল দুইজন অনুচর তাঁহার সেবা করিবে।

সন্ন্যাসী হওয়ার কয়েক মাস পরে তিনি রাজপুরী ত্যাগ করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি নাপিত ডাকাইয়া মাথা মুড়াইলেন এবং গেরুয়া কাপড় পরিয়া মাটির একটি ভৃঙ্গার হাতে একদিন রাজপুরী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

রাণী সীবলী তাহা জানিতে পারিয়া রাজার পিছনে পিছনে পায়ে হাঁটিয়া ছুটিলেন—সঙ্গে চলিল অমাত্যবর্গ, দাসদাসীগণ, হস্তী, অশ্ব ও পৌরবর্গ। রাণী রাজার পায়ে পড়িয়া কত সাধাসাধি করিতে লাগিলেন, অমাত্যগণ কত বুঝাইল, পৌরবর্গ কত কান্নাকাটি করিতে লাগিল—কিন্তু রাজা ফিরিলেন না, মিথিলা হইতে কিছুদূর আসিয়া এক বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এদিকে রাণীর উপদেশমত মন্ত্রীরা দীনদরিদ্রগণকে নগরের মধ্যে স্থান দিয়া খড়, শর ইত্যাদি জড়ো করিয়া চারিপাশে আগুন ধরাইয়া দিল। রাণী রাজাকে বলিলেন—"দেখুন প্রভু, আপনার মিথিলা পুড়ছে, ঐ দেখুন অগ্নিশিখা ও ধূমরাশি। আপনার মিথিলা আপনার চোখের সম্মুখে পুড়ে যাবে, আর আপনি তাই দেখবেন? আপনি ফিরুন—মিথিলাকে বাঁচান। আপনার বিচ্ছেদে ব্যাকুল হয়ে মিথিলাবাসীরা আপন আপন ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আপনি ফিরুন, নইলে সব গেল।" বোধিসত্ত্ব উত্তর করিলেন—"মিথিলা দগ্ধ হলে আমার কিছুই দগ্ধ হয় না। আমি যা ছেড়ে এসেছি, তার জন্যে আমার কোন মমতা নেই।"

সীবলী বলিলেন—"প্রভু, একি কথা বলছেন! আপনারই ত সব। আপনি দেশের রাজা। প্রজাগণও আপনারই। এমন করে সব ভুলে গেলেন!"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন—"ভদ্রে, কাল আমার সব ছিল। আজ আমার কিছুই নেই। এ দেহটাও আমার নয়।"

বোধিসত্ত্ব আগাইয়া চলিলেন, পিছনের দিকে ফিরিয়াও তাকান না। সীবলী আর চলিতে পারেন না। কিন্তু তবু তিনি সঙ্গ ছাড়িলেন না। বোধিসত্ত্ব নিজের দণ্ড দিয়া পথে একটা দাগ কাটিয়া বলিলেন, "এরপর যে আসবে, তার দণ্ড হবে।" মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"এই দাগ যে পার হবে, তাকে দণ্ড দাও, মন্ত্রী!" রাজার আদেশ শুনিয়া সবাই থমকিয়া দাঁড়াইল। সীবলী কিন্তু সে আদেশ মানিলেন না। তিনি বলিলেন—"আপনি যখন রাজত্ব ত্যাগ করেছেন তখন আপনার আদেশ মানতে কেউ বাধ্য নয়। মন্ত্রীরও দণ্ড দেবার অধিকার নেই।" তখন সকলে আবার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল।

রাজার মনে ক্ষত্রিয়ের তেজ জাগাইবার জন্য মন্ত্রীরা পরামর্শ করিয়া এক উপায় বাহির করিলেন। দলের মধ্যে যাহারা খুব বলবান্ ও উগ্রপ্রকৃতির লোক, তাহাদিগকে আদেশ দিলেন—"তোমরা এগিয়ে গিয়ে দু'ধারের গ্রামবাসীদের যথাসর্বস্ব লুট করো। গ্রাম-বাসীদের আগে হতে বলে দিও, এটা ছলনার অভিনয় মাত্র, তারা সবই ফেরত পাবে। তারা যেন উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি করে এবং মহারাজের পায়ে পড়ে যেন বলে—"মহারাজ, দস্যুরা আমাদের ঘরবাড়ী ভেঙেগ ফেলছে, যথাসর্বস্ব লুট করছে। মহারাজ রক্ষা করুন—আমরা প্রাণে মারা যাই।"

বোধিসত্ত্ব ক্রোশখানেক আগাইয়া গিয়া দেখিলেন, চারিপাশে লুট-তরাজ চলিতেছে। দুর্বল গ্রামবাসীদের ঘর হইতে সবল দস্যুরা সব কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে। তাহারা আসিয়া মহারাজের পথরোধ করিয়া পায়ে পড়িয়া বলিতে লাগিল—"মহারাজ, রক্ষা করুন। আমাদের সর্বস্ব যায়।" মহারাজ মন্ত্রী ও সেনাপতির দিকে আঙগুল দেখাইয়া নির্বিকারচিত্তে আগাইয়া চলিলেন। বোধিসত্ত্ব দেখিলেন—কিছুতেই রাণী ও রাজ-অনুচরদের তাড়ানো যায় না। তখন তিনি সীবলীকে বলিলেন—"ভদ্রে, তুমি সঙেগ আসতে চাও, এস, সঙেগর লোকজনকে চলে যেতে বল। তোমার সঙেগ আমার অনেক কথা আছে।" একথা শুনিয়া সীবলী আশ্বস্ত হইয়া মন্ত্রী, অমাত্য ও অনুচরগণকে পথে অপেক্ষা করিতে বলিয়া রাজার পিছনে পিছনে আগাইয়া গেলেন। কিছুদূর আগাইয়া রাজা সম্মুখে একটি গভীর বন দেখাইলেন। এই বনের কাছে আসিয়া রাজা একটি তৃণ ছিঁড়িয়া লইয়া দুই টুকরা করিয়া সীবলীকে বলিলেন—"ভদ্রে, এই ঘাসের দুই টুকরাকে তুমি জোড়া লাগাতে পার? তোমার সঙেগ আমার বিচ্ছেদ ঘটেছে, আর জোড়া লাগবে না। তুমি ফিরে যাও। আমি আর ফিরব না।" এই কথা শুনিয়া সীবলী আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি "হা ভগবান!" বলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। এই অবসরে বোধিসত্ত্ব গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কয়েক দণ্ড পরে সঙেগর লোকজন আসিয়া পেঁছিল। তাহারা

দেখিল, তাহাদের রাণী ধূলিশয্যায় পড়িয়া আছেন। তাহারা রাণীর মুখে চোখে জল দিল, রাণী চোখ মেলিয়া বসিলেন। কিন্তু রাজা কোথায় গেলেন? অনুচরবর্গ বনের মধ্যে ঢুকিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ করিতে লাগিল—রাজার আর দেখা পাইল না। তখন রাণীকে তাহারা রথে চড়াইয়া রাজপুরীতে ফিরাইয়া আনিল। রাণী রাজপুরীতে আসিয়া বালক পুত্রকেই রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া মন্ত্রীদের হাতে রাজ্যভার দিলেন। তারপর যে-আম্রকাননে রাজার বৈরাগ্যভাবের উদয় হইয়াছিল, সেই আম্রকাননে নিজে শ্রমণী হইয়া একটি পাতার কুটিরে বাস করিতে লাগিলেন। যেখানে প্রব্রজ্যাকালে মহারাজ বসিয়াছিলেন, সেখানে রাণী একটি চৈত্য নির্মাণ করাইয়া দিলেন। বহু বৎসর পরে রাজা হিমালয়প্রদেশ হইতে নামিয়া আসিয়া রাণীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

আত্মত্যাগ

পূরাকালে বোধিসত্ত্ব একবার শশক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনটি বন্ধু লইয়া তিনি বনে বাস করিতেন—একটি বানর, একটি শৃগাল এবং একটি উদ্‌বিড়াল। ইহারা তিনজনেই শশক-পণ্ডিতকে গুরু বলিয়া মানিত।

সারাদিন ইঁহারা আহারের খোঁজে ঘুরিতেন—সন্ধ্যার সময় একত্রে মিলিত হইতেন।

শশকপণ্ডিত তিন বন্ধুকে ধর্মোপদেশ দিতেন, তাহারা নিবিষ্টচিত্তে তাহা শুনিত।

এক চতুর্দশী তিথিতে শশকপণ্ডিত বন্ধুদের বলিলেন, "কাল পূর্ণিমা, উপোস-ব্রতের দিন। কাল সারাদিন ধর্মচিন্তা করে উপ-

বাসী হয়ে থাকতে হবে এবং কোন অতিথি ভিখারী এলে তাঁকে যত্ন করে খাওয়াতে হবে।” বন্ধুগণ ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া বিদায় হইল।

উদ্‌বিড়াল খাদ্যের অন্বেষণে নদীর ধারে বেড়াইতে লাগিল। এক জায়গায় মাছের গন্ধ পাইয়া বালি খুঁড়িয়া দেখিল—কলার বাসনায় বাঁধা কয়েকটি ছোট ছোট রুইমাছ বালির মধ্যে পোঁতা রহিয়াছে। উদ্‌বিড়াল তিনবার চীৎকার করিয়া বলিল—“এ মাছ কার?” কেউ জবাব দিল না। তখন উদ্‌বিড়াল দাঁতে ধরিয়া টানিতে টানিতে মাছগুলিকে বাসায় লইয়া আসিল। আর বানর আমবাগানে গিয়া কতকগুলি আম কুড়াইয়া লইয়া আসিল।

শৃগাল গেল লোকালয়ের দিকে। সেখানে গিয়া দেখিল—এক গোয়ালার বাড়ীর উঠানে একভাঁড় দই শিকেয় বাঁধা আছে। শৃগাল শিকেটা গলায় জড়াইয়া লইয়া দইয়ের ভাঁড়টি বাসায় লইয়া আসিল। সকলেই পরদিন অতিথির আশায় বসিয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল—কোন অতিথির দেখা নাই। শশকপণ্ডিতের কোন যোগাড়ই নাই। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—অতিথি আসিলে তিনি কি দিয়া তাহাকে তুষ্ট করিবেন? অতিথি যদি তৃণভোজী না হয়, তাহা হইলে কি উপায় হইবে? ভাবিয়া তিনি ঠিক করিলেন—ভাবনা কি? তাঁহার নিজের এই দেহই তো রহিয়াছে! শশকের মাংস বেশ সুখাদ্য; এই মাংস দিয়াই অতিথির সেবা করিবে। বন্ধুরা যে সমস্ত খাদ্য সংগ্রহ করিয়াছেন—সেগুলি যেমন অনিত্য, তাঁহার দেহও তো তেমনি অনিত্য। যাহা অনিত্য, তাহা ত্যাগ করিতে আর দুঃখ কি?

এই সংকল্পের কথা শক্রদেব স্বর্গে থাকিয়া জানিতে পারিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বের ত্যাগধর্মের পরীক্ষা করিবার সংকল্প করিলেন। প্রতিজন্মেই শক্রদেব বোধিসত্ত্বের পরীক্ষা করিতেন। তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে বনে আসিলেন। ব্রাহ্মণ একে একে শৃগাল, বানর ও উদ্‌বিড়ালের দ্বারে আসিয়া আতিথ্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের সংগৃহীত খাদ্য সম্মুখে ধরিলেন। ব্রাহ্মণ তাহা স্পর্শ না করিয়া শশকপণ্ডিতের দ্বারে আসিয়া হাঁকিলেন—“অয়মহং ভোঃ, ক্ষুধার্ত অতিথি উপস্থিত।”

শশকপণ্ডিত বলিলেন—"আপনি আগুন জ্বালুন। আপনার খাদ্য প্রস্তুত করছি।"

শক্রদেব একটি অগ্নিকাণ্ড জ্বালিলেন—শশকপণ্ডিত বলিলেন—"ব্রাহ্মণ, আমি অগ্নিতে প্রবেশ করছি, আমার দেহ আধপোড়া হলেই আগুন থেকে তুলে ভক্ষণ করবেন।" এই বলিয়া শশকপণ্ডিত আগুনে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শশকপণ্ডিতের গায়ের একটি লোমও দগ্ধ হইল না, আর অগ্নিকুণ্ড পদ্মবনে পরিণত হইল। শশকপণ্ডিত তখন বলিলেন—"ব্রাহ্মণ, এ তো আগুন নয়, আসল আগুন জ্বালুন!" শক্রদেব তখন বলিলেন—"আমি ব্রাহ্মণ নই, আমি শক্র, তোমার ত্যাগধর্ম পরীক্ষার জন্য আমি এসেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, তুমি মনে মনে দেহদানের সংকল্প করেছ বটে, কিন্তু জ্বলন্ত আগুন দেখলে সংকল্প স্থির থাকবে না। ধন্য তোমার আত্মত্যাগ, জগতে এর তুলনা নেই। তোমার এই আত্মত্যাগকে জগতে অক্ষয় আর চিরসমুজ্জ্বল করে রাখবার জন্য এই পূর্ণিমার চন্দ্রমণ্ডলে তোমার চিহ্ন অঙ্কিত করে দিলাম। আজ হতে চন্দ্র শশধর নাম ধারণ করে তোমার ত্যাগের মহিমা জগতে প্রচার করবে। তোমার এই ত্যাগের আদর্শ কল্পান্তস্থায়ী হোক।"

এই বলিয়া শক্রদেব শশকপণ্ডিতকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

এক

বৈশালীর লিচ্ছবিরা ছিল বড়ই তার্কিক। তর্কবিদ্যাকে তাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া মনে করিত। দুইজনের মধ্যে তর্ক বাধাইয়া দিয়া তাহারা বেশ আমোদ পাইত। একবার একজন সাধু বৈশালীতে আসিয়া তর্কে সকলকে হারাইয়া দিয়া খুব আদর পাইয়াছিলেন। এই সময়ে একজন রমণীও বৈশালীতে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহার সহিত ঐ সাধুর তুমুল তর্ক বাধিয়া গেল। লিচ্ছবিরা দেখিল, দুই-জনেই তর্কবিদ্যায় নিপুণ। তখন তাহারা ঠিক করিল—যদি ইহাদের দুইজনের মধ্যে বিবাহ দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহাদের সন্তানগণ নিশ্চয়ই তর্কযুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষের দিগ্‌বিজয়ী বিতণ্ডাবীর হইবে। ইহাতে বৈশালীর গৌরব বাড়িবে।

লিচ্ছবিরা খুব ঘটা করিয়া দুইজনের বিবাহ দিল। কালক্রমে ইহাদের চারিকন্যা হইল। এই কন্যাগুলি পিতামাতার নিকট হইতে

তর্কবিদ্যায় বিশেষ জ্ঞানলাভ করিল। পিতামাতা কন্যা চারিটিকে বলিলেন—"যদি কোন গৃহী তোমাদের তর্কে হারিয়ে দেয়—তবে তোমরা তাকে বিয়ে করবে। আর যদি কোন শ্রমণ সন্ন্যাসী তোমাদের হারিয়ে দেয়, তবে তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে তোমরা ভিক্ষুণী হবে।" কন্যাগণ দিগ্‌বিজয়ের জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যেখানে যান, তর্কসভা বসে—তর্কে কেহই তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারে না। ক্রমে তাঁহারা শ্রাবস্তী নগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া নগরের লোকদের তর্করণে আহ্বান করিলেন, কিন্তু কেহই সাহস করিয়া আগাইল না।

নগরের বাহিরে জেতবনের বিহারে এই সময়ে বাস করিতেন বুদ্ধদেবের সহচর সারিপুত্র। তিনি যখন শুনিলেন, নগরে চারিটি বালিকা তর্কের জন্য আসিয়াছেন এবং নগরের পণ্ডিতরা কেহই তাঁহাদের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডায় যোগ দিতে সাহস করেন নাই, তখন তিনি নিজেই তাঁহাদের তর্করণে আহ্বান করিলেন।

বিহারের আঙিনায় বিরাট সভা বসিয়া গেল। বিহারের অন্য সকল ভিক্ষুশ্রমণ সেখানে সমবেত হইল—অপূর্ব তর্করণ দেখিবার জন্য নগরের লোকেরা দলে দলে সেখানে আসিয়া জুটিল। বালিকারা ক্রমে ক্রমে অনেক কঠিন প্রশ্ন করিলেন। সারিপুত্র অনায়াসে সব-গুলির উত্তর দিলেন। বালিকারা প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন—কিছু-তেই কিছু করিতে পারিলেন না। তখন সারিপুত্র বালিকাদের একটিমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। বালিকারা বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াও তাহার উত্তর দিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা সারিপুত্রের চরণে প্রণত হইয়া নিজেদের পরাজয় স্বীকার করিলেন। সকলের যিনি বড়, তিনি বলিলেন—"ভদন্ত, আমাদের মাতাপিতা আদেশ করে গিয়েছেন, যদি তোমরা কোন গৃহীর নিকট তর্কে পরাজিত হও—তা হলে তোমরা তাঁর গৃহিণী হবে, আর যদি কোন শ্রমণ বা সন্ন্যাসীর নিকট পরাজিত হও, তা হলে তাঁর কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা নেবে। আপনার কাছে আমরা যখন পরাজিত হলাম তখন আমাদের সন্ন্যাস দীক্ষা দান করুন।"

নগরের লোকেরা ইহাতে 'হায় হায়' করিতে লাগিল, এমন সুন্দরী বালিকারা মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসিনী হইবেন—ইহাতে সকলের হৃদয় ব্যথিত হইল। এই তরুণীরা সংসারের ভোগসুখের কোন আস্বাদ পাইলেন না—তর্কে হারিয়া বাধ্য হইয়া ইঁহাদিগকে সন্ন্যাসিনী হইতে হইল—তাহাতেই সকলের ক্ষোভ। স্থবিরা উৎপলবর্ণা যখন বালিকাদিগকে দীক্ষাদান করিলেন এবং নাপিত যখন তাঁহাদের মাথার সুন্দর চুলগুলি চাঁছিতে লাগিল, তখন একজন বলিয়া উঠিন—"যাঁদের রাজমহিষী হবার কথা, তাঁদের এ কী শাস্তি! এমন নির্বোধ পিতামাতা ত' দেখিনি যে, এমন শপথও কন্যাদের দিয়ে করায়!"

এই কথা শুনিয়া সারিপুত্র বলিলেন—"তোমরা এদের জন্য ক্ষোভ করো না। রাজমহিষীর ভোগবাসনা এদের পূর্বজন্মেই মিটে গিয়েছে। এরা পূর্বজন্মে রাজমহিষীই ছিল। মহিষী হয়ে এরা প্রাণভরে ভোগ করেছে—দান করেছে সারাজীবন ধরে। সে জীবনে এরা অনেক পুণ্যকর্ম করেছিল—তারই ফলে এ জন্মে এরা ঐরূপ দৈবী শক্তি পেয়েছে।"

সারিপুত্র রাজকন্যাদের পূর্বজন্মের কথা বলিতে লাগিলেন।

দুই

পূর্বজন্মে এই চারিকন্যা কলিঙ্গরাজ্যে দন্তপুর নগরে রাজকন্যা হইয়াই জন্মিয়াছিল। কলিঙ্গরাজ একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার একমাত্র দুঃখ ছিল—তাঁহার সমকক্ষ রাজা ভারতবর্ষে কেহই নাই—কাহার সহিত তিনি যুদ্ধ করিবেন? তাঁহার বহু হস্তী, অশ্ব, রথ ও বহু সৈন্য ছিল—কিন্তু সবই থাকিত অকেজো হইয়া। রাজা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কোন রাজাই তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করিত না। এদিকে তাঁহার কন্যা চারিটি বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিল। তাহাদের বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দাম্ভিক রাজা কোন রাজার কাছে এজন্য নতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কোন রাজা বা রাজপুত্রও

কলিঙ্গরাজের কন্যাদের সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিতে সাহস করিল না।

অমাত্যগণের পরামর্শে রাজা স্থির করিলেন, কন্যা চারিটিকে তিনি দেশে দেশে বহু সৈন্যসামন্তের সঙ্গে পাঠাইবেন। এই অপূর্ব-সুন্দরী কন্যাদিগকে যদি কেহ বিবাহ করিবার জন্য আটক করে, তবে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে তিনি মুক্ত করিবেন। চারিটি হস্তীতে চড়িয়া চারিজন রাজকন্যা আগে আগে চলিল। রাজার গজ-সৈন্য, অশ্বারোহী সৈন্য ও পদাতিক সৈন্য তাহাদের পিছু পিছু চলিল। তাহাদের পিছনে চলিল বিরাট রাজভাণ্ডার ও দাসদাসী।

দুই বৎসর ধরিয়া কন্যারা বঙ্গদেশে ভ্রমণ করিল। কেহই কলিঙ্গ রাজকন্যাদের আটক করিতে সাহস করিল না। শেষে তাহারা অশ্বক-রাজ্যের গোতালিনগরে উপস্থিত হইল। অশ্বক ভয়ে কন্যাদের নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন। অশ্বকের নন্দিসেন নামে এক বুদ্ধিমান তরুণ সেনাপতি ছিলেন। তিনি ভাবিলেন—ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা বড়ই কলঙ্কের কথা। একজন রাজাও কলিঙ্গরাজের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে পারিবে না, তাহা হইতে পারে না। দুঃসাহসী সেনাপতি রাজকন্যাদিগকে নগরের মধ্যে আটক করিলেন। কলিঙ্গ-রাজের নিকট এ সংবাদ পৌঁছিল। কলিঙ্গরাজ তখন বিশাল বাহিনী লইয়া অশ্বকরাজ্যের সীমান্তে উপস্থিত হইলেন। রাজা অশ্বক প্রাণভয়ে রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব সন্ন্যাসী হইয়া ঐ রাজ্যের এক প্রান্তে একটি পাতার কুটীরে বাস করিতেন। কলিঙ্গরাজের ইচ্ছা হইল—তাঁহাকে একবার যুদ্ধের ফলাফলের কথা জিজ্ঞাসা করেন।

কলিঙ্গরাজ বোধিসত্ত্বের কুটীরে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "ভদন্ত, এই যুদ্ধে কার জয় হবে দয়া করে বলুন।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "কাল এসো। শক্রদেব সন্ধ্যাকালে আসবেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে বলব।"

পরদিন রাজা বোধিসত্ত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে বোধিসত্ত্ব বলিলেন—"কলিঙ্গরাজের জয় হবে।" কলিঙ্গরাজ হৃষ্টমনে শিবিরে

ফিরিয়া গেলেন। তারপর নন্দিসেন আসিলেন—তিনিও এই প্রশ্ন
জিজ্ঞাসা করিলেন। বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "কলিঙ্গরাজেরই জয়
হবে।" নন্দিসেন উত্তরে দমিলেন না। তিনি শিবিরে ফিরিয়া সৈন্য-
গণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন—"যদি তোমরা তোমাদের
রাজাকে ভালবাস, যদি তোমাদের জন্মভূমির প্রতি মমতা থাকে, যদি
স্বজাতির গৌরবরক্ষা করতে চাও, তা হলে তোমাদের প্রাণ উৎসর্গ
করতে হবে।" বলাবাহুল্য বোধিসত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী তাহাদিগকে
জানাইলেন না। সৈন্যগণ একবাক্যে উত্তর করিল—"আমরা জীবন
উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছি।"

কলিঙ্গরাজ শিবিরে গিয়া সৈন্যগণকে বলিলেন, "একজন সিদ্ধ-
পুরুষ বললেন, আমাদের নিশ্চয় জয় হবে, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।"

যথাকালে যুদ্ধ বাধিল। কলিঙ্গের সৈন্যগণের ধ্রুব বিশ্বাস—
তাহাদের জয় হইবে। কাজেই তাহারা তত মন দিয়া যুদ্ধ করিল না।
তাহা ছাড়া, তাহাদের নিজেদের শক্তিতে এমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে,
তাহারা অশ্বকের সেনাগণের উপর অবজ্ঞাভরে বলপ্রয়োগ করিতে
লাগিল।

অশ্বকের সেনাগণ বীরদর্পে প্রাণপণ করিয়া যুঝিতে লাগিল।
নন্দিসেন তাহাদের আগে আগে ঘোড়ায় চড়িয়া তাহাদিগকে চালনা
করিতে লাগিলেন। কয়েক সহস্র মাত্র সৈন্য লইয়া নন্দিসেন বিপুল
বিক্রমে কলিঙ্গরাজের বিশাল বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। ফলে
কলিঙ্গরাজ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

যুদ্ধে জয় হইয়াছে শুনিয়া অশ্বক রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন।
নন্দিসেন বলিলেন—"মহারাজ, কলিঙ্গরাজের কন্যা চারিটিকে
আপনি বিবাহ করুন।" অশ্বক বলিলেন—"নন্দিসেন, তুমিই যুদ্ধ
করে কন্যাগুলিকে জয় করেছ—তুমিই এদের বিবাহ কর।" নন্দি-
সেন ইহাতে সম্মত হইলেন না। এই ব্যাপার লইয়া দুইজনের মধ্যে
তুমুল তর্ক বাধিয়া গেল। শেষে কন্যা চারিটিকেই মীমাংসার ভার
দেওয়া হইল। রাজকন্যারা নন্দিসেনকেই বরণ করিলেন।

অশ্বকরাজ কলিঙ্গরাজের কাছে চারিকন্যার জন্য যৌতুক চাহিয়া

পাঠাইলেন। কলিঙ্গরাজ বহু ধনরত্ন, দাসদাসী, অশ্ব-হস্তী যৌতুক-স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন।

যুদ্ধ শেষ হইলে শক্রদেব যখন বোধিসত্ত্বের কুটীরে উপস্থিত হইলেন, তখন বোধিসত্ত্ব শক্রদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে আপনি সত্য কথা বললেন না কেন? আমি যে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি না।" শক্রদেব বলিলেন—"আমি সত্য কথাই বলেছিলাম। তখন পর্যন্ত যা সত্য ছিল, আমি তা-ই বলে-ছিলাম। কলিঙ্গরাজ বিজয়ী হবে বলেছিলাম, তা-ও যেমন সত্য—অশ্বকরাজ বিজয়ী হয়েছে তা-ও তেমনি সত্য। ভবিষ্যদ্বাণী শুনবার পূর্ব পর্যন্ত কলিঙ্গরাজ সম্বন্ধে যে সত্য ছিল, সে সত্যকে নন্দি-সেনের পুরুষকার উল্‌টিয়ে দিয়েছে। কলিঙ্গরাজ আর তাঁর সৈন্যরা উপেক্ষা ও শৈথিল্যের দ্বারা সে সত্যের অন্যথা ঘটিয়াছে।"

"ভবিষ্যদ্বাণী কলিঙ্গরাজের উৎসাহ ও পরাক্রম শিথিল করল, তা-ই নন্দিসেনের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলল। ভবিষ্যদ্বাণী নিজে যে অঘটন-ঘটন ঘটাল, তার জন্য আমি দায়ী নই—দায়ী নন্দিসেনের তেজোবিক্রম, সাহস ও পুরুষকার। নন্দিসেন সৈন্যদের ভবিষ্যদ্বাণী জানায়নি। কলিঙ্গরাজ জানিয়েছিল—এখানেই কলিঙ্গরাজের ভুল হল। পরের সত্য এসে আগের সত্যকে সরিয়ে দিল।"

কলিঙ্গরাজের পুত্রসন্তান ছিল না, সেজন্য জামাতা নন্দিসেনই কলিঙ্গরাজ্যের রাজা হইলেন। রাজমহিষী হইয়া রাজকন্যারা বহুদিন পর্যন্ত রাজসুখসম্ভোগ করিলেন। তাঁহাদের যৌবন বিগত হইলে তাঁহারা ধর্মকার্যে মন দিলেন। রাজভাণ্ডারের সমস্ত অর্থ তাঁহারা দীন-দুঃখীদের কল্যাণের জন্য ব্যয় করিলেন। তাঁহারা অনেক মঠ, মন্দির, বিহার, আরোগ্যশালা, অন্নসত্র, জলসত্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিলেন—নিজেরা ব্রত-উপাসনা, তপজপ, ধ্যানধারণা, অতিথিসেবা ইত্যাদিতে জীবন উৎসর্গ করিলেন। পূর্বজন্মে এই সকল সৎকর্ম করার জন্য এজন্মে তাঁহাদের শ্রমণী হইতে হইল—তাঁহারা দৈবী শক্তির অধিকারিণী হইলেন। তোমরা ইঁহাদের জন্য বৃথা ক্ষোভ করিতেছ। ইঁহারা সৎকর্মের পুরস্কার পাইলেন। অনেক জন্মের পুণ্যফলে তবে মানুষ এরূপ সন্ন্যাসিনী-জীবন লাভ করে।

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে হিমালয় প্রদেশের একটি বনে বোধিসত্ত্ব কাঠঠোকরা পাখী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাঠ-ঠোকরা এক উঁচু গাছের ডালে বাসা বাঁধিয়া বাস করিত। ঠিক ঐ গাছের নীচে একটি সিংহ থাকিত। একবার মাংস খাইতে গিয়া সিংহের গলায় হাড় ফুটিয়া গেল। তাহাতে সিংহের গলা ফুলিয়া উঠিল, আর রক্তপুঁজ পড়িতে লাগিল। সিংহ যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া কাঠ-ঠোকরার মনে দয়া হইল। সিংহের কাছে গিয়া কাঠঠোকরা বলিল—পশুরাজ, তুমি যদি আমার কোন অনিষ্ট না কর, তা হলে তোমার গলার হাড় বার করে দিয়ে তোমাকে বাঁচিয়ে দিতে পারি।

সিংহ অভয়দান করিলে কাঠঠোকরা সিংহের গলায় নিজের লম্বা ঠোঁট ঢুকাইয়া অতি সন্তর্পণে হাড়ের টুকরাটি বাহির করিয়া আনিল। সিংহ সে-যাত্রা বাঁচিয়া গেল। সিংহ দুইদিন পরে সুস্থ-সবল হইয়া আবার বীরবিক্রমে শিকার করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন—"পরীক্ষা করে দেখা যাক, মানুষের মত সিংহটাও অকৃতজ্ঞ কি না!"

একদিন একটা বন্য মহিষ বধ করিয়া সিংহ পরমানন্দে তাহার মাংস খাইতেছে দেখিয়া কাঠঠোকরা বলিল—"পশুরাজ, আমার মাংস খেতে ইচ্ছা করছে, দয়া করে আমাকে কি একটুকরো মাংস দেবেন?"

সিংহ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল—"কে তুই? তোর এত বড় স্পর্ধা—তুই আমার আহারের অংশ চাস্!"

কাঠঠোকরা বলিল—"পশুরাজ, আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি নিজের জীবন বিপন্ন করে আপনার গলার ভিতর থেকে হাড় বের করে দিয়ে আপনাকে ক'দিন আগে বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম। আমি সেজন্য কোন পুরস্কার চাইনি—আজ মাত্র একটুকরো মাংস চাচ্ছি।"

সিংহ উত্তর করিল—

"দয়া ক্লৈব্যং ন যো বেদ খাদন্ বিস্ফুরতো মৃগান্।
প্রবিশ্য তস্য মে বক্ত্রং যাজ্জীবসি ন তদ্বহু।"

"যাহার দয়া-দাক্ষিণ্য নাই, বনবিহারী মৃগদের যে বধ করিয়া খায়, তাহার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও যে বাঁচিয়া আছিস্, ইহাই কি যথেষ্ট মনে করিস না? দূর হ' হতভাগা!"

কাঠঠোকরা বলিল—"অকৃতজ্ঞ পশু, আমার মাংসে প্রয়োজন নেই—মাংস আমার খাদ্য নয়, আমি কেবল পরীক্ষা করছিলাম মানুষের মত পশুরাও অকৃতজ্ঞ কি না। তোর মত অকৃতজ্ঞ পশু যে-বনে বাস করে, সে-বন বাসের যোগ্য নয়। আমি অন্যত্র চললাম।"

সিংহ বীরবিক্রমে পশু বধ করিয়া বেড়ায়। যে অসাবধান, সে ঠেকিয়াও শেখে না। অসাবধানতার জন্য আর একদিন মাংস খাইতে গিয়া তাহার গলায় হাড় ফুটিল। বহু চেষ্টাতেও সে-হাড় বাহির করিতে পারিল না। গলা ফুলিয়া গেল, আহার বন্ধ হইল—ক্রমে

শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। গাছের উঁচু ডালের দিকে কাতর চোখে তাকাইয়া সিংহ ভাবিতে লাগিল—আহা, আজ যদি কাঠঠোকরা থাকিত! সে শুধু একটুকরা মাংস চাহিয়াছিল, কতশত-টুকরা মাংস আমি খাইতে না পারিয়া ফেলিয়া দিই, সেইরকম একটুকরা মাংস কাঠঠোকরাকে দিলে আজ আমাকে এমন করিয়া মরিতে হইত না।

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সিংহ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।
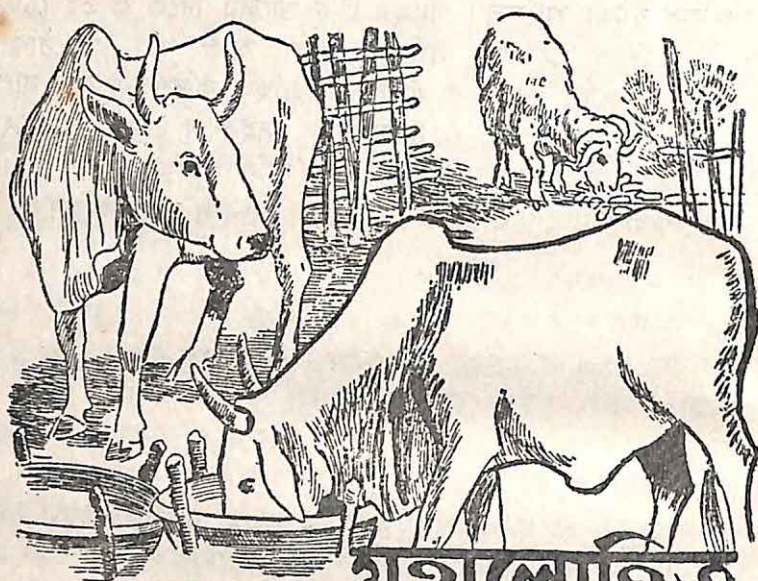
মহালোহিত

প্রাচীনকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বুদ্ধদেব বলদ হইয়া এক গৃহস্থের বাড়ীতে জন্মিয়াছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল মহালোহিত। তাঁহার সাথী বলদটির নাম ছিল চুল্ললোহিত।

দুই বলদে গৃহস্থের জমি চাষ করিত—গাড়ী টানিত—আরও অনেক কাজ করিত। তাহাদের গোহালের কাছে একটি ভেড়ার কুঁড়ে ছিল। সেই কুঁড়েতে একটি ভেড়া থাকিত। এই ভেড়াটিকে বাড়ীর গৃহিণী পাকা ফলের খোসা, ছোলা, মটর, ভাত ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইত এবং খুব যত্ন করিত। পাশেই বলদ দুইটি ঘাস-বিচালি খাইত আর ভেড়ার আদরের আতিশয্য লক্ষ্য করিত। মহা-লোহিত ইহা দেখিয়া দুঃখিত হইত না—নিবিষ্ট মনে ঘাস-বিচালি চিবাইত। চুল্ললোহিতের ইহা ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। ভেড়াটিকে সুখাদ্য খাইতে দেখিয়া তাহার আহারে অরুচি জন্মিল। মহালোহিত ইহা লক্ষ্য করিয়া একটু হাসিয়া বলিল—ভায়া, তোমার কি কোন অসুখ করেছে?

চুল্ললোহিত—না, শরীরের কোন অসুখ করে নি।

মহালোহিত—তবে মনের অসুখ? মনের অসুখের কারণ কি?

চুল্ললোহিত—কারণ কি, তা আবার জিজ্ঞাসা করছ, দাদা? দেখছ না গিন্নীমায়ের ব্যবহার!

মহালোহিত—কই, আমি ত' গিন্নীমায়ের কোন অন্যায় আচরণ দেখতে পাচ্ছি না, ভাই!

চুল্ললোহিত—আমাদেরই পাশে একটা নিষ্কর্মা ভেড়াকে তিনি নিজে হাতে ভাল ভাল খাবার খাইয়ে যাচ্ছেন—আর আমাদের পানে তাকাচ্ছেনও না। আমাদের ভাগ্যে সেই রাখালের হাতে ঘাস-বিচালি! একে কি অবিচার মনে কর না?

মহালোহিত—তাতে কি হল ভাই? ঘাস-বিচালিই ত' আমাদের খাদ্য। তা-ই আমরা চিরকাল খেয়ে আসছি, ভাই! আমাদের চৌদ্দ-পুরুষও তা-ই খেয়ে আসছে।

চুল্ললোহিত—তা ত' জানি। আমরা গৃহস্থের জন্য প্রাণপাত করে পরিশ্রম করি—আর ভেড়াটা কোন কাজই করে না। অথচ ভাল ভাল খাদ্য গিন্নীমা আমাদের না দিয়ে ভেড়াটাকে দিচ্ছেন! এমন অন্যায় আচরণ কখনও দেখিনি।

মহালোহিত—রাগ করো না, ভেবে দেখ—কারণ অবশ্যই আছে। আমরা খেটে মরি, তবু ছোলা-মটর আমাদের না দিয়ে ওকে দিচ্ছেন কেন? এটা ত' ভাববার কথা।

চুল্ললোহিত—তা-ই ত' আমি ভেবে পাচ্ছি না। এ কেবল আমাদের অপমান করার জন্য। আমাদের চোখের সম্মুখে একটা ভেড়াকে আদর করা—এ ইচ্ছে করে আমাদের অনাদর করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি আর মন দিয়ে এদের কাজ করব না—কাজের ক্ষতি করবারই চেষ্টা করব।

মহালোহিত—ভায়া, অমন কাজ করো না, একটু চিন্তা করে দেখ। গৃহস্থ বড় সজ্জন, তিনি এতদিন আমাদের প্রতিপালন করেছেন। তাঁর অপকার করো না।

চুল্ললোহিত—প্রতিপালন করেছেন সত্য, খেতেও দিচ্ছেন বটে

বিনা কারণে ত' আর দিচ্ছেন না। আমরা খেটেছি, খাটছি, তাই দেন —অমনি ত' দেন না!

মহালোহিত—ভেড়াকেও অকারণে যত্ন করে খাওয়াচ্ছেন না—সে-ও উপকার করবে।

যাহাই হউক, চুল্ললোহিত বুঝিল না, সে বিদ্রোহী হইল। সে মন দিয়া আর খাটিত না, কাজের ক্ষতি করিত—ভাল করিয়া খাইত না।

কিছুদিন পরে গৃহস্থের কন্যার বিবাহ উপস্থিত হইল। বিবাহের দিন প্রাতঃকালে দুইজন লোক ভেড়াকে বধ করিয়া তাহার মাংস খন্ড খন্ড করিয়া কাটিতে লাগিল।

সে দৃশ্য দেখিয়া চুল্ললোহিত মহালোহিতকে বলিল—দাদা, একমাস ধরে সুখাদ্য খাওয়ানোর একী পরিণাম! ব্যাপার কী?

মহালোহিত—ভায়া, আমি ত' আগেই বলেছি—ভেবে দেখ। কন্যার বিবাহের জন্যই গৃহস্থ ভেড়াটিকে পুষেছিলেন। যাতে মাংসের পরিমাণ বেশী হয়, সেজন্য ভাত-রুটি খাইয়ে ওকে মোটা করানো হচ্ছিল। ওকে যেদিন আনা হয়, সেদিন ওর যে ওজন ছিল, আজ তার দ্বিগুণ হয়েছে। বিনা কারণে প্রভু-গৃহিণী নিজ হাতে ওকে খাওয়াননি। তুমি মিছামিছি না বুঝে গৃহস্থের উপর রেগে তার ক্ষতি করছিলে।

চুল্ললোহিত—হাঁ দাদা, আমি এখন বুঝেছি। না বুঝে রাগ করে বড় অন্যায় করেছি।

মহালোহিত—ভায়া, ঘাস-বিচালি খেয়ে পরিশ্রম করে জীবিত থাকা ঢের ভাল। রাশি রাশি সুখাদ্য খেয়ে, শুয়ে শুয়ে ভুঁড়ি মোটা করে অকালে বিদায় নেওয়া কখনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অনেকে ভোগ-লালসার বশবর্তী হয়ে তাদের দেহে ঐরূপ মেদ-মাংস বাড়াতে থাকে। তাদের দেখে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া ঠিক নয়—কর্তব্যকর্মে অবহেলা করাও ঠিক নয়।

নাদুশ-নুদুশ দেহ দেখে হিংসা কর কেন?
তার পরিণাম দেখলে চোখে, ভুল করো না যেন।
লোভ করো না রাজভোগে ভাই, বাঁচতে যদি চাও
খেটে-খুটে বাড়াও ক্ষুধা, ঘাস-বিচালি খাও।

যোগী ও ভোগী

ব্রহ্মদত্ত তখন বারাণসীর রাজা। মগধ দেশের একটি গ্রামে এক ধর্মভীরু জমিদার ছিলেন। তিনি সাধুসন্তদের ভারি ভক্তি করিতেন। জটাধারী অথবা মুণ্ডিতশির লোক দেখিলেই তিনি ভক্তিতে তাঁহার পায়ের তলে লুটাইয়া পড়িতেন।

একবার এক সন্ন্যাসী তাঁহার গৃহে অতিথি হইলেন। তাঁহার মাথার জটা প্রায় পায়ে লুটাইয়া পড়িয়াছে। এতবড় লম্বা জটা দেখিয়া জমিদারের বড়ই ভক্তি হইল। সন্ন্যাসীর জটার অনুযায়ী সেবার জন্য জমিদার যথেষ্ট আয়োজন করিলেন। সেবার আয়োজন দেখিয়া সন্ন্যাসী আর নড়িতে চাহেন না। তখন জমিদার তাঁহার বাগানবাড়ীতে একখানা ঘর তৈরি করাইয়া দিলেন। সন্ন্যাসীর দুই-বেলা বেশ আহার চলিতে লাগিল। প্রত্যহ জমিদার তাঁহার কাছে গিয়া বসিতেন,—সন্ন্যাসী জমিদারকে বহু ধর্মোপদেশ দিতেন। জমিদার ভক্তিতে গদ্‌গদ্‌ হইতেন। ক্রমে সন্ন্যাসীর দেহ বেশ নাদুশ-নুদুশ হইয়া উঠিল।

এইভাবে বৎসর কাটিয়া গেল। এই সময় দেশে চোর-ডাকাতের বড় উপদ্রব হইল। জমিদার নিত্যই ডাকাতির খবর পাইতে লাগিলেন। তিনি ঠিক করিলেন—সন্ন্যাসী ত' বসিয়া খাইতেছেন, তাঁহাকেই ধনসম্পদ-রক্ষার ভার দেওয়া যাক।—সন্ন্যাসী ত' সর্বত্যাগী—ধনরত্নে তাঁহার নিশ্চয়ই লোভ নাই। এই ভাবিয়া জমিদার সন্ন্যাসীর কুটীরের মেঝেয় গর্ত করিয়া মূল্যবান অলঙ্কার ও মণি-মুক্তাগুলি পুঁতিয়া রাখিলেন। তাহার উপর উচ্চাসনে বাঘছাল পাতিয়া সন্ন্যাসী শুইয়া থাকিতেন।

এদিকে সন্ন্যাসী একদিন বলিলেন—দেখ বৎস, তুমি আমাকে ভোগী করে তুললে। আমি তোমার এখানে থাকব, কিন্তু তোমার রাজভোগ আর আমি স্পর্শ করব না।

এই বলিয়া সন্ন্যাসী পায়স, পিষ্টক, ঘৃত ও মিষ্টান্ন বর্জন করিলেন। জমিদার বলিলেন—ঠাকুর, আপনি এ-সব না খেলে আমরাই বা খাব কি করে?

সন্ন্যাসী বলিলেন—দেখ, তোমরা ভোগী, তোমাদের এ-সবই খাদ্য ; আমি যোগী, আমার পক্ষে এ-সব খাদ্য বর্জনীয়। তবু যে এতদিন খেয়েছি, তা কেবল তোমার তুষ্টির জন্য। আমি দেখছি, এতে ক্রমেই আধ্যাত্মিক অবনতি হচ্ছে। সন্ন্যাসীর পক্ষে গৃহবাসও নিষিদ্ধ। তবে যে আমি রয়েছি, সে শুধু তোমার আত্মার কল্যাণ-সাধনের জন্য।

জমিদার নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

সন্ন্যাসী ক্রমে সকল খাদ্যই ত্যাগ করিয়া সারাদিন উপবাস করিয়া সন্ধ্যার সময় ফল-জল খাইতে লাগিলেন। জমিদার দুঃখিত হইতেন। সন্ন্যাসী বলিতেন—আমি একটা ব্রত পালন করছি।

তিনি সারাদিন হোম জপ ইত্যাদি লইয়াই থাকিতেন,—সেবার জন্য যেসকল ভৃত্য ছিল, একে একে তাহাদের বিদায় দিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন—আমার নির্জনে থাকার প্রয়োজন। আমি যে-সাধনা করছি, নিকটে কোন লোকজন থাকলে তাতে ব্যাঘাত হয়।

জমিদার ক্রমে বাগানবাড়ী হইতে লোকজন সরাইয়া লইলেন।

সন্ন্যাসী একদিন জমিদারকে বলিলেন—বৎস, সন্ন্যাসীর এক স্থানে বেশীদিন থাকা ভাল নয়, কেবল তোমার ভক্তি ও সেবায় তুষ্ট হয়ে তোমার আত্মার কল্যাণের জন্য এখানে আছি। এইবার আমি তীর্থপরিক্রমায় বা'র হব।

জমিদার কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিলেন—আর কিছুদিন অধমের কুটীরে থেকে যান। আমাদের এখনো দীক্ষাগ্রহণ হয়নি।

সন্ন্যাসী বলিলেন—আচ্ছা, তোমাদের দীক্ষা দিয়ে আমি বিদায় নেব। আবার এক বছর পরে ফিরে আসব।

জমিদার ও তাঁহার পত্নী একদিন দীক্ষা লইলেন। দীক্ষার দক্ষিণার জন্য জমিদার যাহা দিলেন, সবই সন্ন্যাসী ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—আমি সন্ন্যাসী মানুষ, এ-সব নিয়ে কি করব? তুমি দীন-দুঃখীদের এগুলি দিয়ে দাও।

তারপর একদিন প্রাতে উঠিয়াই সন্ন্যাসী যাত্রা করিলেন। জমিদার কাঁদিতে কাঁদিতে পিছনে পিছনে অনেক দূর গেলেন। শেষে সন্ন্যাসীর পীড়াপীড়িতে জমিদার ফিরিলেন। জমিদার কিছুদূর আসিতেই দেখিলেন, সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিতেছেন। জমিদার দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—দেখ, তোমার বাগানবাড়ীর কুটীর হতে বেরিয়ে আসার সময় খড়ের চালের এই কুটোটা আমার জটায় আটকে গিয়েছিল। সন্ন্যাসীর কিছুই নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। তাই এই কুটোটা তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ফিরে এলাম। এই নাও তোমার কুটোটা।

জমিদার সন্ন্যাসীর অনাসক্তি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন এবং ভাবিলেন আসল সন্ন্যাসী ইঁহাকেই বলে।

গ্রামে প্রবেশ করিয়া জমিদার গ্রামের বাজারের মধ্য দিয়া ফিরিতে-ছিলেন। এক শ্রেষ্ঠী জমিদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি খালি-পায়ে কোথা গিয়েছিলেন?

জমিদার সব কথা বলিলেন—সেই সঙ্গে জটার কুটোটার কথাও বলিলেন। শ্রেষ্ঠীর বিপণিতে একজন বণিক পণ্য ক্রয় করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্ব। এ জন্মে বোধিসত্ত্ব বণিক্ হইয়া

জন্মিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—তাই ত', সন্ন্যাসী ত' ভারি অনাসক্ত! তাঁর ঝুলিঝোলা ভালো করে সন্ধান করে দেখেছেন ত'?

একথা শুনিয়া জমিদার ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইলেন। তিনি বলিলেন—আপনি মুখ সামলে কথা বলবেন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন—আপনি ঘর সামলে সন্ন্যাসীকে বিদায় দিলে ভাল করতেন। যা-ই হোক, যে-ঘরে সন্ন্যাসী ছিলেন, সে-ঘরের জিনিসপত্রগুলো সব আছে কিনা বাড়ী গিয়ে খোঁজ করবেন। আপনি এখানে আর দেরি করবেন না। বাড়ী যান।

জমিদার এই অপরিচিত লোকটার প্রগল্‌ভতা ও অযাচিত উপদেশে বিরক্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর কুটীরে গিয়া মেঝেটা খুঁড়িলেন। সহজেই ঝুরো মাটি উঠিয়া আসিল। জমিদারের বুক ঢিপঢিপ করিতে লাগিল। হাত দুই খোঁড়ার পর তামার কলসীটা উঠিল। তাহাতে হাত দিয়া দেখেন—তাহা শূন্য! তখন জমিদার ছুটিলেন বাজারের দিকে। বোধিসত্ত্বের কাছে গিয়া সমস্ত ব্যাপার বলিলেন—তারপর দুইজনে ঘোড়ায় চড়িয়া চলিলেন সন্ন্যাসীকে ধরিতে।

তাঁহারা প্রায় ক্রোশ দুই পর্যন্ত গিয়াও সন্ন্যাসীর দেখা পাইলেন না। তখন তাঁহারা ফিরিলেন। খানিকটা আসিয়া রাস্তার ধারে বনের মধ্যে একটা ভাঙা বাড়ীতে বোধিসত্ত্ব জমিদারকে লইয়া গেলেন।

ভাঙা বাড়ীর এককোণে সন্ন্যাসীর চিমটেটা পড়িয়া আছে। রাশীকৃত ইট-সুরকির খানিকটায় সদ্য-খোঁড়া গর্ত। তখন দুইজনে বনটা তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর আর দেখা পাইলেন না।

বোধিসত্ত্ব চিমটেটা জমিদারকে দিয়া বলিলেন—যান, এবার বাড়ী গিয়ে এই চিমটেটার পূজো করুন গে। ভোগীরাই যোগীর সর্বনাশ করে। এই সন্ন্যাসীর নির্বাপিতপ্রায় কামনার আগুনে আপনিই ইন্ধন যুগিয়েছেন। আপনার হল ঐহিক ক্ষতি, আর সন্ন্যাসীর হল পারমার্থিক ক্ষতি।

তরুণের মরণ

বুদ্ধদেব যখন বোধি (দিব্যজ্ঞান) লাভের পর কপিলাবাস্তুতে আগমন করিলেন, তখন শুদ্ধোদন বলিলেন—বৎস, একজন সন্ন্যাসী এসে আমাকে বলেছিলেন—তোমার পুত্র অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

বুদ্ধদেব বলিলেন—তাত, আপনি তা শুনে বড়ই শোক পেলেন নিশ্চয়।

শুদ্ধোদন—না বৎস, আমি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললাম—আমি বিশ্বাস করি না ; আমাদের বংশে কেউ কখনও তরুণ বয়সে মরে না।

বুদ্ধদেব বলিলেন—তাত, পূর্বজন্মেও ঠিক এই ঘটনা ঘটেছিল, আপনি পূর্বজন্মেও একথা বিশ্বাস করেন নি। আপনি কাশীরাজ্যে ধর্মপাল নামে এক সদাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। আপনি যে-বংশে জন্মেছিলেন, সে-বংশে কেউ কখনও পাপ করেনি। আমি আপনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। উপনয়নের পর আপনি আমাকে

তক্ষশিলায় শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেখানে একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিতের কাছে অধ্যয়ন করে আমি বহু বিদ্যা অর্জন করেছিলাম। একদিন সহসা আচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হল। আচার্য শোকাতুর হয়ে পড়লেন—শিষ্যগণ তাঁকে প্রবোধ দিতে লাগলেন। কিন্তু শোকার্ত পিতা কিছুতেই সান্ত্বনা পেলেন না। আমি বললাম—দেব, যে গিয়েছে, সে ত' ফিরবে না ; তরুণ বয়সে আর কোন সন্তান যাতে মারা না যায়, তারই ব্যবস্থা করুন।

গুরু—বৎস, তা কি মানুষের হাতে যে ব্যবস্থা করব ?

আমি—হাঁ দেব, তা মানুষেরই হাতে। বংশে কোন পাপ প্রবেশ না করলে তরুণ বয়সে কারও মৃত্যু হয় না। নিশ্চয়ই আপনার বংশে কোন পাপ প্রবেশ করেছে—তাই এই অঘটন ঘটল।

গুরু—বৎস, পাপপুণ্যের সঙ্গে কি এর কোন সম্বন্ধ আছে ? এমন কোন পরিবার কি দেখাতে পার—যে-পরিবারে কেউ-না-কেউ তরুণ বয়সে মরেনি ?

আমি—হাঁ, তা দেখাতে পারি। আমাদের বংশে কেউ কখনও তরুণ বয়সে মরেনি।

গুরু—তোমরা এমন কি ধর্ম আচরণ কর, যাতে এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব হয়েছে ?

আমি—আমি ঠিক বলতে পারি না, আমার পিতা এ বিষয়ে সব কথা বলতে পারেন।

আচার্য মনে মনে বড় খুশী হলেন না, আমার কথাও বিশ্বাস করলেন না। কিছুদিন পরে আচার্য বললেন—আমার কিছুতেই চিত্ত স্থির হচ্ছে না। আমি কিছুকালের জন্য তীর্থ-পর্যটনে যাব।

আমি শিষ্যগণের ভার নিলাম। আচার্য একেবারে কাশীরাজ্যে ধর্মপালের গৃহেই উপস্থিত হলেন। গৃহের পরিজনগণ তাঁকে ধর্মপালের অর্থাৎ আপনার নিকট পরম আদরে নিয়ে গেল। আচার্য বললেন—আমি আপনার পুত্রের আচার্য। তীর্থ-ভ্রমণের জন্য কাশীধামে এসেছি। আজ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলাম।

ধর্মপাল আচার্যের চরণে প্রণাম করে বললেন—বোধিসত্ত্বের

শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন দেখছি না। কারণ, সে নিশ্চয়ই ভাল আছে। তবে তার শিক্ষা-দীক্ষার কতদূর হল, তা-ই বলুন।

আচার্য বললেন—আর শিক্ষা-দীক্ষা! সর্বশাস্ত্রে সে পারদর্শী হয়েছিল ; শিক্ষা-দীক্ষার চরম সীমায় সে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু হায়, সহসা কঠিন ব্যাধিতে তার মৃত্যু হয়েছে!

এই বলে আচার্য ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলেন।

আপনি একথা শুনে অট্টহাস্য করে উঠলেন ; দাসদাসী ও পরিজনগণ করতালি দিয়ে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল। আচার্য ত' ব্যাপার দেখে অবাক্! তিনি বললেন—এমন দারুণ দুঃসংবাদ শুনেও হাসছেন! আপনারা পাগল নাকি? হায় হায়, তার মত শিষ্য আমার আর হবে না।

আপনি বললেন—আমার পুত্র সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হয়েছে শুনে সুখী হলাম। সে কবে বাড়ী ফিরবে?

আচার্য বললেন—হায় মূঢ় স্নেহান্ধ পিতা! পুত্রের মৃত্যুসংবাদ বিশ্বাস করতে দারুণ বেদনা বলে তা বিশ্বাস করছেন না।

আপনি বললেন—আচার্য, আপনি ভুল করছেন। আমার পুত্রের সমবয়সী আপনার অন্য কোনো শিষ্যের নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়েছে। আমার পুত্র তরুণ বয়সে মরতে পারে না। এই বংশে কেউ কখনও তরুণ বয়সে মরেনি। ইতিমধ্যে আমার বংশে এমন কোন পাপ প্রবেশ করেনি, যাতে এই অঘটন ঘটতে পারে।

আচার্য থলি থেকে একখণ্ড অস্থি বার করে বললেন—গঙ্গায় সমর্পণ করবার জন্য তার একখণ্ড অস্থি পর্যন্ত আমি এনেছি। এই অস্থি গ্রহণ করে গঙ্গায় সমর্পণ করি—তার শেষ ইচ্ছা তা-ই ছিল।

একথা শুনে সমগ্র গৃহে হাস্যের কলরোল উঠল। আপনি নিজেও হো হো করে হেসে বললেন—আপনি পরীক্ষা করতে এসেছেন নিশ্চয়! ঐ অস্থি হয়তো কোন শিয়াল-কুকুরের হবে। ছি, ছি, ফেলে দিন। আচার্য, আপনি শান্ত হয়ে স্নানাহার করে বিশ্রাম করুন। অভিনয়ে আপনার যথেষ্ট ক্লেশ হচ্ছে।

আচার্য তখন আপনার চরণে পতিত হয়ে বললেন—কিরূপ ধর্মাচরণ করলে বংশে তরুণ বয়সে কারও মৃত্যু হয় না—সেই তত্ত্ব জানবার জন্য আমি তক্ষশিলা থেকে আপনার কাছে এসেছি। যে-বিদ্যা শিক্ষা করতে কাশী থেকে আপনার পুত্র তক্ষশিলা গিয়েছে তা অপেক্ষা ঢের বড় বিদ্যা আপনিই শিখাতে পারেন, তাই বোধিসত্ত্বের উপদেশে আপনার কাছে সেই বিদ্যা শিক্ষা করতে এসেছি। আমি যে-বিষয়ে পণ্ডিত, তা তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর।

আপনি বললেন—আচার্য, আপনি বোধ হয় দারুণ পুত্রশোক পেয়েছেন। আচ্ছা, আপনি আমার গৃহে কিছুকাল অবস্থান করুন এবং লক্ষ্য করুন—আমরা কিভাবে জীবনযাপন করি। তা হলেই আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। মুখে কিছু বলবার প্রয়োজন হবে না।

আচার্য তিনমাস ধর্মপালের অর্থাৎ আপনার গৃহে অবস্থান করে দশশীলসম্মত আদর্শ ধর্মাচরণ কাকে বলে, তা-ই শিখে চলে গেলেন।
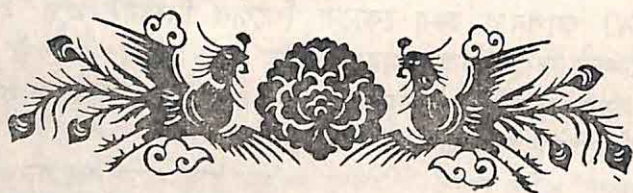
পৃথিবীর ধ্বংস

পশ্চিম সমুদ্রতটে এক বনে এক শশক বাস করিত। শশকটি একটি বিল্ব ও একটি তালবৃক্ষের তলে এক বিবরে বাস করিয়া সারারাত্রি স্বপ্ন দেখিত—কত কি কল্পনা করিত।

একদিন তাহার মনে হইল—যদি এই পৃথিবীর ধ্বংস হয়, তাহা হইলে কি হইবে! কি করিয়া সে বাঁচিবে? কোথায় সে আশ্রয় লইবে? এই ভাবিয়া সে আকুল হইয়া উঠিল।

এমন সময় গাছ হইতে একটি বেল পড়িল—কিছুক্ষণ পরেই একটি তাল পড়িল। উপরি উপরি ধুপ-ধাপ শব্দে সে চমকাইয়া উঠিল। তারপর মনে হইল—পৃথিবীর ধ্বংস নিশ্চয়ই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

যেমন মনে হওয়া, অমনি সে বিবর হইতে বাহির হইয়া ঊর্ধ্ব-শ্বাসে ছুটিতে লাগিল। পথে যে শশকের সঙ্গে তাহার দেখা হইল, তাহাকেই সে পৃথিবীর ধ্বংসের কথা জানাইল। তাহারাও উহার

সঙ্গে ছুটিতে আরম্ভ করিল। পথে অন্য যে-জন্তুর সঙ্গেই তাহার দেখা হইল, সে-ই এই দুঃসংবাদ শুনিয়া শশকের সঙ্গে ছুটিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে বনের অন্যান্য জন্তু যে যেখানে ছিল, তাহারা আর কারণের খোঁজ না লইয়া পলাতকদের দলে যোগ দিল। শেষে বনের একটি প্রাণীও আর স্থির থাকিল না—সকলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। কেন ছুটিতেছে, কেহই জানে না।

এই সময় বোধিসত্ত্ব সেই বনে সিংহরূপে বাস করিতেছিলেন।

তিনি যখন দেখিলেন—বন শূন্য করিয়া সব পলাইতেছে, তখন তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া পলাতক প্রাণীদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পথরোধ করিলেন।

সিংহ—তোমরা এমন দল বেঁধে পালাচ্ছ কেন?

মহিষ—কেন তা ত' জানি না, সবাই পালাচ্ছে বলে আমিও পালাচ্ছি। ঐ শৃগাল জানে।

সিংহ—শৃগাল, তোমরা এমনভাবে পালাচ্ছ কেন?

শৃগাল—আমিও জানি না কেন পালাচ্ছি। ভাবলাম, নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটেছে—সেজন্য পালাচ্ছি। বোধ হয় বনে আগুন লেগেছে। ঐ ভল্লুক জানে।

ভল্লুক ব্যাঘ্রকে, ব্যাঘ্র মৃগকে, মৃগ গণ্ডারকে দেখাইয়া বলে—"ঐ জানে—ঐ জানে। ওর পালানো দেখে আমিও পালাচ্ছি।"

শেষে যে-শশকের কথায় সকলে পলাইতেছে, তাহার সন্ধান হইল। সে বলিল—"প্রভু, পৃথিবী ধ্বংস হচ্ছে বলে আমরা পালাচ্ছি।"

সিংহ—কি ক'রে জানলে পৃথিবী ধ্বংস হচ্ছে?

শশক—ধুপ-ধাপ শব্দ শুনে।

সিংহ—বেশ, তোমরা পালাচ্ছ কোথায়? পৃথিবী ছেড়ে কোথায় যাবে? পৃথিবী ছেড়ে যাওয়া যায়? পৃথিবীর যদি ধ্বংসই হয়, তবে কি পালিয়ে বাঁচা যায়?

পশুরা বলিল—তা ত' বটে! তবে আমরা কি করব?

সিংহ—তোমরা ফিরে আপন আপন আস্তানায় যাবে, এভাবে

ছুটোছুটি করলে তোমরাই ধ্বংস পাবে—পৃথিবী যেমন তেমনি থেকে যাবে। শোন মূর্খরা, পৃথিবীর ধ্বংস কেন হবে? পৃথিবীর যদি কোন দিন ধ্বংস হয়—তবে কোথাও গিয়ে পরিত্রাণ পাবে না। জগতে সবই অনিত্য, এই পৃথিবীও অনিত্য, এই পৃথিবীও ধ্বংস পাবে—কিন্তু কোন শশকের কথায় নয়। গাছ থেকে ফল পড়ার শব্দে যে মূর্খ মনে করে যে, পৃথিবীর ধ্বংস হচ্ছে—তার ক্ষীণপ্রাণের কথা শুনলে তোমরাই ধ্বংস পাবে। এই শশকটার মত ভীরু কল্পনাপ্রবণ জীব মানুষের মধ্যেও অনেক আছে, তারা মানব-সমাজের বড় ক্ষতি করে। ওরা মনে করে,—নিজেরা অমর আর সব ক্ষণস্থায়ী।

সিংহের উপদেশ শুনিয়া কেহ কেহ বলাবলি করিতে লাগিল—"পশুরাজের প্রজারা পালালে উনি রাজত্ব করবেন কোথায়?—তাই আমাদের ফেরাচ্ছেন। চল, আমরা পালাই।"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর কাহারও পলাইবার সাহস হইল না। ক্রমে তাহারা দেখিল—কোথাও কোন বিপদের লক্ষণ নাই, শুধু গুজব শুনিয়াই তাহারা ছুটিতেছিল। তখন তাহারা অলস-কল্পনাপ্রবণ শশকটিকে মারিয়া ফেলিল।

আম্র জাতক
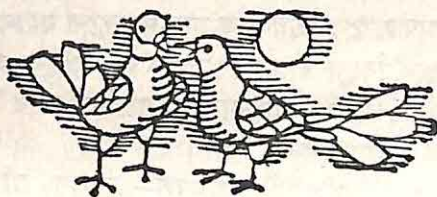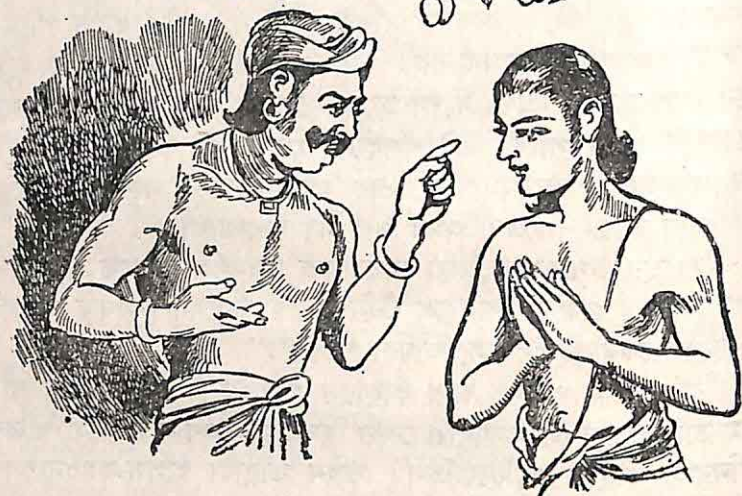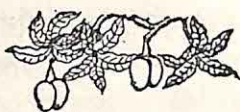
এক চণ্ডালের একটি অদ্ভুত বিদ্যা জানা ছিল। সে কোন আমগাছের তলায় দাঁড়াইয়া মন্ত্র পড়িলেই অকালে গাছে আম ধরিত—দেখিতে দেখিতে আম পাকিয়াও উঠিত। সে সারা বছর এই আম বিক্রয় করিয়াই সংসার চালাইত।

সঞ্জয় নামে অলস-প্রকৃতির এক ব্রাহ্মণপুত্রের ধারণা হইল—চণ্ডাল নিশ্চয়ই কোন যাদুবিদ্যা জানে। তাহা না হইলে সারা বৎসর সে আম কোথায় পায়। আম ফলাইবার বিদ্যা শিখিবার জন্য ব্রাহ্মণপুত্র চণ্ডালের বাড়িতে গিয়া ধর্‌না দিল।

চণ্ডাল তাহাকে দেখিয়াই বুঝিল—তাহার চরিত্র ভাল নয়। চণ্ডাল তাহাকে মন্ত্র শিখাইতে চাহিল না। সঞ্জয় নাছোড়বান্দা হইয়া চণ্ডালের বাড়িতে পড়িয়া থাকিল। সে চণ্ডালীকে মা বলিয়া ডাকে, দিনের পর দিন পাকা আম পেট ভরিয়া খায়, আর চণ্ডালের চাকরের কাজ করে।

সঞ্জয়ের সেবায় তুষ্ট হইয়া চণ্ডালী চণ্ডালকে ধরিয়া বসিল— "সঞ্জয় আমাদের ছেলের মত, ওকে মন্ত্র শেখাতেই হবে।"

চণ্ডাল রাজী হইল। সঞ্জয়কে চণ্ডাল বলিল—"দেখ বাছা, তোমাকে মন্ত্র শেখাচ্ছি। কিন্তু যদি কোন দিন তুমি লজ্জায় গুরুর নাম গোপন কর, তা হলে মন্ত্রের শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি বামুনের ছেলে, আর আমি চণ্ডাল কিনা—চণ্ডালকে গুরু বলে স্বীকার করতে তোমার লজ্জা হবার কথা।"

সঞ্জয় জিভ কাটিয়া বলিল—"সে কি গুরুদেব! তা-ই কি করতে পারি? সে ভুল আমার হবে না। গুরু যে, সে গুরুই—ব্রাহ্মণই হোক আর চণ্ডালই হোক।"

সঞ্জয় মন্ত্রলাভ করিয়া চণ্ডালের বাড়ীর পাশেই এক গাছের তলায় দাঁড়াইয়া মন্ত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিল। মন্ত্রের বলে গাছে মুকুল ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে আম ফলিল ও পাকিল—সে আমের স্বাদ গ্রহণ করিয়া সঞ্জয় বারাণসীধামে ফিরিয়া আসিল। চণ্ডাল সংসার চালাইবার জন্য মন্ত্রের ব্যবহার করিত, ধনী হইতে সে চাহে নাই। সঞ্জয় ধনবান হইবার জন্য মন্ত্রের ব্যবহার করিতে লাগিল। সে আমের ব্যবসায় করিয়া ক্রমে ধনবান হইল। তাহাকে যে-ই জিজ্ঞাসা করিয়াছে—আম ফলাইবার মন্ত্র কোথায় শিখিলে?—সে চণ্ডাল-গুরুরই নাম করিয়াছে। ক্রমে সঞ্জয়ের আম রাজবাড়ীতে আদর পাইতে লাগিল। কাশীরাজ শীতকালে তাঁহার খাবারের থালায় প্রচুর মিষ্ট আম দেখিয়া খোঁজ লইলেন—"কোথা থেকে অকালে এত আম এল?"

দাসীরা সঞ্জয়ের বাগানের কথা বলিল। রাজা সঞ্জয়কে ডাকইয়া পাঠাইলেন। সঞ্জয় আসিলে রাজা বলিলেন—"তোমার বাগানে বারোমেসে আম ফলে শুনলাম। এ আমের চারা তুমি কোথায় পেলে?"

সঞ্জয় বলিল—"মহারাজ, আমার বাগানের গাছ দেশী আমেরই গাছ—বারোমেসে আমের গাছ নয়। আমি মন্ত্রবলে দেশী আমের গাছেই যে-কোন সময়ে আম ফলাতে পারি।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় এ মন্ত্র পেলে?"

সঞ্জয় আমের ব্যবসায়ে ধনী হইয়াছে। নিজে ব্রাহ্মণের ছেলে। রাজার সম্মুখে চণ্ডাল-গুরুর নাম করিতে অপমানবোধ হইল। দিনে বিশবার যে মন্ত্র উচ্চারণ করা যায়, তাহা ত' আর সে নিশ্চয়ই ভুলিবে না—এই ভাবিয়া সে বলিয়া বসিল—"তক্ষশিলার এক বৌদ্ধ মহাস্থবিরের শিষ্য হয়ে বহু সাধনা করে আমি এ মন্ত্র শিখে এসেছি।"

পরদিন রাজা সঞ্জয়ের বাগানে আসিলেন আম খাইতে। সঞ্জয় মন্ত্র স্মরণ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই মন্ত্র মনে আসিল না। রাজা সঞ্জয়ের দুষ্টামি মনে করিয়া তাহাকে শাস্তি দেওয়ার ভয় দেখাইলেন। তখন সঞ্জয় সব কথা স্বীকার করিয়া বলিল —"মহারাজ, আমার মতিচ্ছন্ন হ'ল আপনার সামনে। আমি মিথ্যা কথা বলেছি। আমি এক চণ্ডালের কাছে মন্ত্র পেয়েছিলাম—লজ্জায় তা স্বীকার করিনি। মিথ্যাকথা বলার দরুন আমার মন্ত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমার দুর্মতির জন্য সত্যই আমি শাস্তির যোগ্য।"

রাজা সঞ্জয়কে যথোচিত তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"মূর্খ, গুরুর আবার জাতবিচার করতে হয়? হীনজাতি হলেও গুরু পূজ্য। তুমি মহাপাপী, তোমার মুখ দেখলেও পাপ হয়। মিথ্যাবাদী, তোমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। আমি আর তোমাকে নূতন শাস্তি কি দেব?"

বিচার
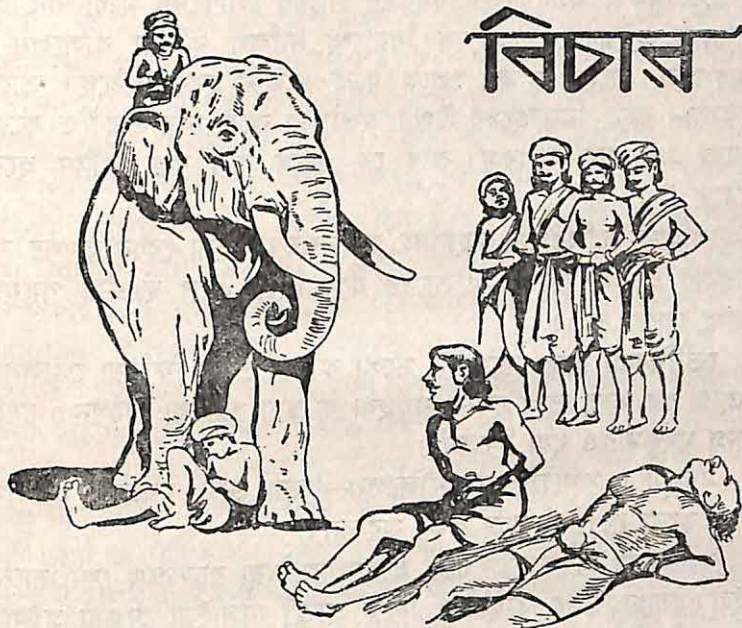
মগধ দেশের মচল গ্রামে এক ব্রাহ্মণের ঘরে বোধিসত্ত্ব একবার মঘকুমার নামে জন্মান। ঐ গ্রামের লোকগুলি ছিল বড়ই দুষ্ট-প্রকৃতির। তাহারা সুরাপান করিত এবং নিরীহ লোকদের উপর অত্যাচার করিত। গৃহস্থের টাকা-কড়ি, ক্ষেতের ফসল, এমন কি গোরু-ছাগলও তাহারা চুরি করিত। মঘকুমার অনেক সদুপদেশ দিয়া, অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া তাহাদিগকে বেশ সদাচারী করিয়া তুলিলেন। ইহাতে গ্রামের ভৌমিকেরা বড়ই বিরক্ত হইলেন। তাঁহারা এইসব দুষ্ট লোকদের জরিমানা করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের বেশ দুই পয়সা উপার্জন হইত। এখন গ্রামের দুর্বৃত্ত লোকেরা আর অপকর্ম করে না! তাহাদের বিরুদ্ধে আর নালিশও হয় না, কাজেই জরিমানাও আদায় হয় না। তাহারা আর সুরাপান করে না, কাজেই সুরার দোকানে আর শুল্কও আদায় হয় না।

ভৌমিকরা মগধরাজের দরবারে গ্রামের লোকদের মধ্যে যাহারা সদাচারী হইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া বলিলেন—"মহারাজ, গ্রামের ক'জন লোক বড়ই দুর্জন হয়ে উঠেছে। তারা সুরাপান করে, নিরীহদের উপর অত্যাচার করে, চুরি-ডাকাতি করে, আরো এমন-সব অপকর্ম করে যে, গ্রামে বাস করা কঠিন হয়ে উঠেছে।"

নালিশ শুনিবামাত্র মহারাজ অগ্নিশর্মা হইয়া কোন তদন্ত না করিয়াই হুকুম দিলেন—"তাদের ধরে নিয়ে এসে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে দাও।"

ভৌমিকরা রাজপুরুষদের সঙ্গে করিয়া গ্রামে ফিরিয়া গেলেন। তাহার পর ভাল ভাল লোক বাছিয়া বাছিয়া ধরাইয়া দিলেন। সেই সঙ্গে মঘকুমারও ধরা দিলেন।

মঘকুমার সঙ্গীদিগকে বলিলেন—"ভয় নেই, বন্ধুরা, ধর্মপথ ত্যাগ করো না। ধর্মরাজ রক্ষা করবেন।"

যথাসময়ে অপরাধীদিগকে ধরিয়া আনিয়া রাজপথে শোওয়ানো হইল। তাহার পর তাহাদের দিকে হাতী চালাইয়া দেওয়া হইল। আশ্চর্যের বিষয়, হাতী কিছুতেই কাহাকেও পদদলিত করিল না। মাহুত খুবই চেষ্টা করিল হাতীকে তাহাদের উপর দিয়া চালাইতে। সে যতবার চেষ্টা করিল, ততবারই হাতী তাহাদের এড়াইয়া এড়াইয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। ব্যাপার দেখিয়া মহারাজ অবাক্ হইয়া গেলেন।

রাজপুরোহিত বলিলেন—"মহারাজ, বোধহয় এরা নিরপরাধ। আর বোধ হয় এদের সঙ্গে কোন মহাপুরুষ আছেন।"

বন্দীরা বলিলেন—"মহারাজ, সত্যই আমরা নিরপরাধ। আর আমাদের সঙ্গে সত্যই একজন মহাপুরুষ আছেন।"

এই বলিয়া তাহারা মঘকুমারকে দেখাইয়া দিল। মহারাজ মঘকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি বল, এদের কোন দোষ নেই?"

মঘকুমার তখন সব কথা খুলিয়া বলিলেন—"মহারাজ, এরা

দুর্জন ছিল, আমার উপদেশে এরা সাধু হয়েছে। তাতে ভৌমিকদের আয় কমে গেছে। আর নালিশও হয় না—জরিমানাও আদায় হয় না। সেজন্য ভৌমিকরা এদের হত্যার জন্য এখানে এনেছে। ধর্মরাজ এদের পক্ষে। ধর্মরাজই হাতীর মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন।''

মঘকুমারের কথা শুনিয়া মহারাজ ভৌমিকদের প্রাণদণ্ড দিলেন। মঘকুমার বলিলেন—''এ বিচারও ঠিক হ'ল না। ভৌমিকরা অপরাধী, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই! কিন্তু আপনি তাদের চেয়ে বেশী অপরাধী। যে বেশী অপরাধী তার অধিকার নেই অপরাধীর দণ্ড-বিধানের। আপনি কোনরূপ তদন্ত না করে ভৌমিকদের মুখে কথা শুনেই এতগুলো লোকের প্রাণ নিচ্ছিলেন, আপনারই আত্মহত্যা করা উচিত। ভৌমিকরা বুঝতে পেরেছে, ধার্মিককে ধর্মরাজই রক্ষা করেন, তারা এমন দুষ্কর্ম আর করবে না। তাদের আর দণ্ড দিতে হবে না। এখন আপনার দণ্ড কি হবে স্থির করুন।''

মহারাজ সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া মঘকুমারের চরণে প্রণত হইলেন এবং তাঁহার পা ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—''ভাল করে তদন্ত না করে আর কোনদিন বিচার করব না। বরং দশজন দোষীকে ছেড়ে দেবো, তবু একজন নিরপরাধের দণ্ডবিধান করব না।''

তিনি ভৌমিকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—''মঘকুমার তোমাদের এ-যাত্রা বাঁচিয়ে দিলেন। ভবিষ্যতে তিনি যদি তোমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করেন, তবে তোমাদের রক্ষা নেই।''

বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়া রাজা বলিলেন—''তোমরা আমাকে ক্ষমা করো, ভবিষ্যতে তোমাদের আর কোন রাজস্ব লাগবে না।''

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব একবার চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নগরের উপকণ্ঠে বাস করিতেন। একদিন তিনি পথের ধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন। একজন শ্রেষ্ঠীকন্যা শিবিকারোহণে উদ্যানে উৎসব করিতে যাইতেছিলেন। মাতঙ্গের বলিষ্ঠ ও সুগঠিত দেহ দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এই লোকটি কে? উত্তরে জানিতে পারিলেন—মাতঙ্গ একজন চণ্ডাল। শ্রেষ্ঠীকন্যা প্রভাতে চণ্ডাল দর্শন হইল মনে করিয়া উদ্যানে না গিয়া গৃহে ফিরিলেন—এবং গন্ধোদক দ্বারা অপবিত্র চক্ষু ধুইয়া ফেলিলেন। সঙ্গের অনুচরগণ উৎসবভঙ্গ হইল বলিয়া বড়ই কুপিত হইল। কোপবশে তাহারা মাতঙ্গকে মারিয়া আধমরা করিয়া রাখিয়া গেল।

মাতঙ্গের এই দুর্দশা দেখিয়া নগর-দেবতাদের ক্রোধের অবধি থাকিল না। তাঁহাদের কোপের ফলে শ্রেষ্ঠীকন্যার চক্ষু দুইটি অন্ধ হইয়া গেল এবং যাহারা প্রহার করিয়াছিল, তাহাদের উত্থানশক্তি রহিত হইয়া গেল। শ্রেষ্ঠীকন্যা বুঝিতে পারিলেন—মাতঙ্গকে ঘৃণা করার জন্যই তাঁহার এই দুর্দশা। তখন শ্রেষ্ঠীকন্যা মাতঙ্গের চরণে আসিয়া শরণ লইলেন। মাতঙ্গ বলিলেন, "তুমি যদি আমার ভার্যা হও, তা হলে তোমার চক্ষু তুমি ফিরে পাবে এবং তোমার অনুচরগণ ও পরিজনগণ আবার উঠে চলাফেরা করতে পারবে।"

শ্রেষ্ঠীকন্যা কি করেন—মাতঙ্গকেই বিবাহ করিলেন। তিনি আবার চক্ষুর দৃষ্টি ফিরিয়া পাইলেন এবং অনুচরবর্গও সুস্থ হইল।

মাতঙ্গ ভাবিলেন—শ্রেষ্ঠীকন্যা বাধ্য হইয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছেন—তাহাকে সমগ্র নগরীর মধ্যে এমনভাবে সম্মানিত করিতে হইবে যে, তাহার কোন ক্ষোভ না থাকে। এই ভাবিয়া মাতঙ্গ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া কঠোর তপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কঠোর তপে শক্রের আসন উত্তপ্ত হইল। শক্র মাতঙ্গের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—"তুমি কি চাও, বৎস?"

মাতঙ্গ বলিলেন—"প্রভু, আমার ভার্যা এমন অলৌকিক শক্তি লাভ করুক যাতে সমস্ত নগরবাসীর সে উপাস্য হতে পারে এবং তার গর্ভে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পুত্র হোক্!"

মাতঙ্গ বর পাইয়া গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু তিনি বেশিদিন গৃহে বাস করিলেন না। ভার্যাকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া প্রব্রজ্যায় চলিয়া গেলেন। মাতঙ্গ-ভার্যার অলৌকিক শক্তির কথা সমস্ত নগরের লোক ক্রমে জানিতে পারিল। একে তো তিনি মাতঙ্গের অলৌকিক শক্তির বলে চক্ষুলাভ করিয়াছিলেন, তারপর তিনি নিজে দুরারোগ্য রোগ সারাইতে পারিতেন। ফলে, চণ্ডালপত্নীর চরণতলে নগরের আপামর সাধারণ মস্তক অবনত করিল। তিনি প্রত্যহ এত রাশি রাশি অর্থ-লাভ করিতে লাগিলেন যে, অল্পদিনেই ধনেশ্বরী হইলেন।

কিছুকাল পরে তাঁহার একটি পুত্র হইল। পুত্রটির বয়ঃক্রম আট বৎসর হইবামাত্র বারাণসীর প্রধান প্রধান আচার্য তাহাকে বেদ ও

অন্যান্য শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ষোল বৎসর বয়সের সময়ই মাতঙ্গ-পুত্র মাণ্ডব্য বেদজ্ঞ ও বহুবিদ্যায় বিশারদ হইয়া উঠিল। ক্রমে তাহার মনে এমন অভিমান জাগিল যে সে নিজে যে চণ্ডালের পুত্র, তাহা ভুলিয়া গেল।

একদিন দৃষ্টমাঙ্গলিকা (ইহাই মাতঙ্গ-ভার্যার নূতন নাম) ষোড়শ সহস্র শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেছিলেন—মাণ্ডব্যকুমার নিজে সুবর্ণ পাদুকা পায়ে দিয়া তাঁহাদের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে 'এই পাতে মধু দাও, এই পাতে পায়েস দাও' ইত্যাদি আদেশ করিতেছিলেন। পুত্রকে শিক্ষ দেওয়ার জন্য মাতঙ্গ যজ্ঞমণ্ডপের এককোণে ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া ধূলি মাখিয়া বসিয়া রহিলেন। যাহাতে তিনি মাণ্ডব্যের চোখে পড়েন, সেজন্য মাঝে মাঝে কাসিতে লাগিলেন।

চোখে পড়িতেই মাণ্ডব্য মাতঙ্গের নিকটে আসিয়া বলিল—"কে হে তুমি—পাংশু পিশাচের মত বসে আছ। এখানে ব্রাহ্মণ, অর্হৎ, ভিক্ষু ও শ্রমণদের ভোজন হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না? এখান থেকে দূর হয়ে যাও।"

মাতঙ্গ—এত আহারের আয়োজন করেছেন—আমি একজন ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক, আমি কি একমুঠো পাব না?

মাণ্ডব্য—হ্যাঁ হ্যাঁ, আয়োজন হয়েছে খুব। কিন্তু সে তোমার জন্য নয়, ধর্মনিষ্ঠ জ্ঞানীদের জন্য। এঁরা ভোজন করলে পুণ্য হবে। তোমার পেট ভরিয়ে কি হবে?

মাতঙ্গ—কৃষক যখন ধান্য বপন করে, তখন উচ্চ, নিম্ন ও জলা-জমি—তিন রকম জমিতেই বীজ বপন করে। কিরূপ বৃষ্টি হবে তার ঠিকানা কি? অতি বৃষ্টি হলে উচ্চভূমির শস্য সে পায়—অল্প বৃষ্টি হলে নীচু জমির শস্য পায়—একেবারে অনাবৃষ্টি হলে জলাজমির শস্য পায়। আপনারও তেমনি সকল জাতির, সকল শ্রেণীর লোককেই দান করা উচিত। কে জানে কাকে দান করলে কিরূপ পুণ্য হবে!

মাণ্ডব্য—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সুক্ষেত্র কাকে বলে তা জানি। সেই-জন্যই ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরই ভোজন করাচ্ছি। যারা নীচু জাতিতে

জন্মগ্রহণ করে তারা পূর্বজন্মে মহাপাপী ছিল। মহাপাপীদের আমি দান করি না।

মাতঙ্গ—যারা জাত্যহঙ্কারে অন্ধ, যাদের মন ক্রোধ, লোভ ও দ্বেষে পূর্ণ তারা কখনও সুক্ষেত্র নয়।

মাণ্ডব্য—বটে! আমার সঙ্গে রীতিমত তর্ক জুড়ে দিলি যে! বেটার ভারি আস্পর্ধা দেখছি। তুই কে বল্ দেখি?

মাতঙ্গ—আমি একজন চণ্ডাল।

মাণ্ডব্য—দূর—দূর! এই, দারোয়ান কোথায়? একে মেরে আধমরা করে বিদায় দাও।

চণ্ডাল মণ্ডপে উঠিয়াছে শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ আহার ত্যাগ করিয়া উঠিল। দারোয়ানরা ছুটিয়া আসিল। দারোয়ানেরা মাতঙ্গের দেহ স্পর্শ করিবার আগেই মাতঙ্গ দিব্য দেহ ধারণ করিয়া আকাশে উঠিয়া বলিলেন—''জ্বলন্ত আগুন কি কেউ গিলতে পারে? নখ দিয়ে কি কেউ পর্বত বিদীর্ণ করতে পারে? দাঁত দিয়ে চিবিয়ে কি লোহা খাওয়া যায়—বেদপাঠ করে তুমি মূর্খ হয়েছ। যে বিদ্যা দ্বেষ-দ্বন্দ্ব দূর করতে পারে না, তা অবিদ্যা।''

মাণ্ডব্য অবাক হইয়া ঊর্ধ্বদিকে চাহিয়া রহিল। নিমন্ত্রিতগণ বমন করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল।

নগরদেবতারা মহাভিক্ষু মাতঙ্গের অপমানে কুপিত হইয়া এক যক্ষকে প্রেরণ করিলেন। যক্ষ আসিয়া মাণ্ডব্যের মুণ্ড মোচড়াইয়া পিঠের দিকে ঘুরাইয়া দিলেন।

এই সংবাদ শুনিয়া দৃষ্টমাঙ্গলিকা ছুটিয়া আসিলেন। পুত্রের দুর্দশা দেখিলেন—নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের দুর্দশাও দেখিলেন।

দারোয়ানদের কাছে আদ্যোপান্ত শুনিয়া তিনি বুঝিলেন—মাতঙ্গ পণ্ডিতের অপমান হইয়াছে, সেজন্য নগরদেবতারা কুপিত হইয়া এই অনর্থ ঘটাইয়াছেন। তখন মাতঙ্গ-ভার্যা মাতঙ্গের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। স্বামীদত্ত অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে তিনি স্বামীকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। এবং তাঁহার চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মাতঙ্গ বলিলেন—''জাত্যভিমানের এই দণ্ড। মাণ্ডব্য যে চণ্ডাল-পুত্র তা সে জানে। তবু সে বেদ পাঠ করে ও ধনেশ্বর হয়ে ভাবছে—সে উচ্চজাতি। আর ঐ ভোজনলোভী দলের সকলেই জানে—মাণ্ডব্য চণ্ডালপুত্র, তবু সে ধনী বলে এবং প্রচুর দক্ষিণার লোভে তার অন্ন ভক্ষণ করছিল। চণ্ডাল বলে মাণ্ডব্য আমার অপমান করল—আমি মণ্ডপে উঠেছিলাম বলে ভোজনলুব্ধের দল আহার ত্যাগ করল! এই কপটাচারের দণ্ড তাদের ভোগ করতেই হবে।''

দৃষ্টমাঙ্গলিকা বলিলেন—''দুর্বুদ্ধির দণ্ড যথেষ্ট হয়েছে—মাণ্ডব্যের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। এখন রক্ষা করুন প্রভু।''

মাতঙ্গ—এখন এক উপায় আছে। আমার উচ্ছিষ্ট অন্ন ঐ মৃৎপাত্রে পড়ে আছে। ঐ অন্নের একমুষ্টি নিয়ে গিয়ে আমারই উচ্ছিষ্ট এ কথা জানিয়ে পুত্রকে খাওয়াও গিয়ে। তাতে পুত্র সুস্থ হবে।

দৃষ্টমঙ্গলিকা ঐ একমুষ্টি অন্ন আনিয়া পুত্রকে বলিল—''মূর্খ, তোমার চণ্ডাল পিতার এই উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করে সুস্থ হও।''

মাণ্ডব্য এখন বুঝিল—বিদ্যা ও ধনের অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া সে নিজের চণ্ডাল পিতারই লাঞ্ছনা ও অপমান করিয়াছে। তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে পরম আগ্রহে উচ্ছিষ্ট অন্ন মুখে দিল। মুখে এই অন্ন দিবামাত্র তাহার মুখ ঘুরিয়া গেল।

মাতা বলিলেন—''আর দুঃশীল লোভী লোকদের ভোজন করিয়ো না। ওরা চণ্ডালকে ঘৃণা করে চণ্ডালেরই অন্ন গ্রহণ করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি অন্নও উদরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওদের বমন করতে হবে। বিদ্যা ও অর্থলাভ করে যারা আপনার জাতি-জন্মের কথা ভুলে যায়,—আর যাকে ঘৃণা করে, অর্থলোভে ও লালসার বশবর্তী হয়ে যারা তারই অন্ন গোগ্রাসে গিলে, তাদের এরূপ দণ্ডই হয়।''

সকল যুগেই আকৃতির মূল্য খুব বেশি। আকৃতির গরিমা যদি না থাকে, তাহা হইলে যত গুণই থাকুক, সহজে তাহা স্বীকৃত হয় না। অর্থের দ্বারা সব জিনিসই কেনা যায়, কিন্তু আকৃতি কেনা যায় না, রূপা দিয়া রূপ কেনা যায় না। শত চেষ্টাতেও রূপের পরিবর্তন করা যায় না। তবে প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য আকৃতি ধার লওয়া বা ভাড়া করা যাইতে পারে! কেমন করিয়া আকৃতিও ভাড়া লওয়া যাইতে পারে, তাহার একটি গল্প বলি।

বোধিসত্ত্ব একবার উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তক্ষশিলায় শিক্ষার্থে গমন করেন। সেখানে অসীম প্রতিভার বলে তিনি বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন, কিন্তু সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব লাভ করিলেন ধনুর্বিদ্যায়। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কর্মের সন্ধানে বাহির হইলেন। কিন্তু তাঁহার কার্যসংগ্রহের একটি মস্ত বড় অন্তরায় ছিল—তিনি ছিলেন কুব্জ ও বামন! কোথাও ঐ

দেহ লইয়া কর্ম প্রার্থনা করিলে কর্ম মিলিবে না। কেহ বিশ্বাসই করিবে না যে, তিনি একজন অদ্বিতীয় ধনুর্ধর!

ঘুরিতে ঘুরিতে ধনুর্ধর অন্ধ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। অন্ধ্র-রাজ্যের সৈন্যবিভাগে কর্মের সন্ধানে যাইবেন সংকল্প করিলেন। কিন্তু কিভাবে কর্ম সংগ্রহ করা যায়, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। পথে পথে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলেন, একটি বিশালকায় যুবক তাঁত বুনিতেছে। তাহার কাছে গিয়া বামন বলিলেন—"তোমার এত বড় বিশাল শরীর, আর তুমি তাঁত বুনে খাচ্ছ? লজ্জা লাগে না?"

তাঁতি বলল—"মূর্খ তাঁতি আমি, কি কাজ আর করব? চৌদ্দ-পুরুষ যা করে ভাত-কাপড়ের যোগাড় করেছে, আমিও তা-ই করছি, ঠাকুর! এতে লজ্জার কি আছে?"

বামন—আমার কথা যদি শোন, আমি তোমাকে ধনবান করে দিতে পারি।

তাঁতি—শুনি কি করে তুমি আমাকে রাতারাতি বড়মানুষ করবে?

বামন—রাজার কাছে গিয়ে বলতে হবে—আমি একজন অদ্বিতীয় ধনুর্ধর। আমাকে কোন কাজের ভার দিন, আমি আমার ক্ষমতা দেখাব। আমার কৃতিত্বে যদি মহারাজ তুষ্ট হন—তবে আমার বেতন বরাদ্দ করবেন।

তাঁতি—তা বললে রাজা না হয় কাজের ভার দেবেন; কিন্তু আমি যে ধনুক ধরতেই জানি না, ঠাকুর, তার কি?

বামন—ধনুক, তোমাকে ধরতেই হবে না—তুমি কেবল সঙ্গে থাকবে—তীর আমি চালাব। আমার মত তীরন্দাজ এ ভারতবর্ষে নেই। কিন্তু আমার চেহারা দেখে কেউ তা বিশ্বাস করবে না। তোমার চেহারা দেখে সকলেই বিশ্বাস করবে—দু'জন মিলে অসাধ্য সাধন করব—তখন আমাদের দারিদ্র্য থাকবে না।

সরলচিত্ত তাঁতি বামনের কথায় বিশ্বাস করিয়া বামন যাহা শিখাইয়াছিল, রাজার নিকটে তাহাই বলিল।

রাজা বলিলেন—"সঙ্গে তোমার কে?"

তাঁতি বলিল—"ওটি আমার ভৃত্য, আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। হাতে হাতে তীর যুগিয়ে দেয়।"

রাজা—আচ্ছা, তুমি কোন কৃতিত্ব দেখালেই তোমার বেতন ঠিক করে দেব।

বামন তাঁতিকে সঙ্গে এইয়া এক সপ্তাহকাল ধরিয়া অনেক বন্য জন্তু শিকার করিয়া আনিলেন। তাহাতে রাজার প্রত্যয় জন্মিল। রাজা ধনুর্ধরের এক হাজার তঙ্কা মাহিনা ঠিক করিয়া দিলেন।

একদিন শোনা গেল, রাজ্যের মধ্যে বনে একটি প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া বড়ই উৎপাত করিতেছে। রাজা বাঘ ধরিয়া আনিতে ধনুর্ধরকে আদেশ দিলেন। তাঁতি বামনের কাছে আসিয়া রাজার আদেশ জানাইল।

বামন বলিলেন—"বাঘ ধরে আনবার ক্ষমতা তো আমার নেই—বাঘকে খুঁজে তীর দিয়ে বেঁধাও বড় কঠিন। তুমি এক কাজ কর। রাজাকে বল, বাঘ ধরতে হলে দু'হাজার বর্শাধারী সৈনিক চাই। ঐ সৈনিকদের নিয়ে বনটা ঘেরাও করবে, তুমি নিজে বনের মধ্যে একটা ঝোপের ভিতর লুকিয়ে থাকবে। চারদিক থেকে তাড়া খেয়ে বাঘ পালাবার পথ খুঁজবে—তখন সৈনিকেরা নিশ্চয়ই বর্শা দিয়ে বাঘটাকে মেরে ফেলেবে। ঠিক সেই সময় কতকগুলো লতা হাতে করে এসে বলবে—

'কে বাঘ মারলে? রাজার হুকুম, বাঘটাকে না মেরে বেঁধে নিয়ে যেতে হবে। আমি বাঘটাকে বাঁধার জন্য লতা আনতে গিয়েছি, আর তোমরা মেরে ফেলে দিলে! ছিঃ ছিঃ! কাজটা ভাল করলে না। যাক্, যা হবার তা হয়ে গেছে—রাজার সামনে তোমরা কেউ যেও না। তিনি রেগে উঠবেন। আমিই ওটাকে রাজার সামনে নিয়ে যাব।'

এই বলে ওটাকে নিয়ে হাতীর ওপর চড়াবে—তারপর আস্তে আস্তে একটা তীর মরা বাঘটার মুখে ঢুকিয়ে দেবে। রাজার কাছে গিয়ে বলবে—মহারাজ, এত বড় বাঘটা জীবন্ত ধরে আনা বড়ই কঠিন —ভেবেছিলাম একটা তীরে মরবে না, একটা তীরে কাবু করে তারপর

বেঁধে আনব ; কিন্তু ওটা একটা তীর খেয়ে অক্কা পেল! কি করব? ধর্মাবতার উপায় নেই।"

তাঁতি বামুনের বুদ্ধি অনুসারে চলিয়া মরা বাঘ দেখাইয়া প্রচুর পুরস্কার লইয়া আসিল।

এইরূপ আরও দুই এক ক্ষেত্রে বামনের বুদ্ধিতে তাঁতি কৃতিত্ব দেখাইল। ক্রমে তাঁতি ধনী হইয়া উঠিল এবং বামনকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল। তাহার ক্রমে বিশ্বাস হইল, বামনের বুদ্ধি না হইলেও চলে। বামন ইহার প্রতিশোধ লইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে এক শত্রু-রাজা আসিয়া রাজার রাজধানী অবরোধ করিল। রাজা তাঁতিকে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। তাঁতি সেনাপতির বেশ পরিয়া হাতীর পিঠে চড়িয়া যুদ্ধযাত্রা করিল। বামন দেখিলেন, ইহা তো ছেলেখেলা নয়। চর্মবর্ম ধারণ করিয়া বামণও হাতীর পিঠে চড়িলেন। শত্রুর সম্মুখীন হইয়া তাঁতি থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

বামন দেখিলেন—আর কেন? এইবার আত্মপ্রকাশ করা যাক, শত্রু-রাজাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিলে আর আমার গুণ কে অস্বীকার করিবে? আকৃতির প্রয়োজন যতদিন ছিল, ততদিন তাঁতিটার সহায়তা লওয়া গিয়াছে, এখন রূপ অপেক্ষা গুণেরই দাম বেশি।

এই ভাবিয়া তিনি কম্পমান তাঁতিকে রাজপথে নামাইয়া দিয়া একাই বীরদর্পে হুঙ্কার করিতে করিতে রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অদ্ভুত শরচালনায় শত্রু-মিত্র উভয় পক্ষই অবাক হইয়া গেল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর শত্রুসেনা পৃষ্ঠভঙ্গ দিল, শত্রু-রাজাকে শরবিদ্ধ অবস্থায় ধরিয়া বামন একেবারে রাজার সম্মুখে দুর্গের দুয়ারে উপস্থিত হইলেন।

রাজা এতদিনে বামনের গুণপনা বুঝিতে পারিলেন। বামন রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন—কেন তাঁতিকে অগ্রে রাখিয়া তিনি কর্ম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অতঃপর বামন-ধনুর্ধরের যশ ভারতময় ব্যাপ্ত হইল। বামনের অনুগ্রহে তাঁতি বেশ ধনী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে আর তাঁত বুনিতে হয় নাই, সে বামনের কাছে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিল।

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত ছিলেন স্বধর্মনিষ্ঠ রাজা—দেবদ্বিজে ছিল তাঁহার অগাধ ভক্তি। তিনি যাহা কিছু দান করিতেন, তাহা দেবতার নামে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের দান করিতেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ভীরু স্বভাবের লোক ছিলেন—একটা কোন বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলেই তিনি ভয় পাইয়া তাহা পুরোহিতদের জানাইতেন। পুরোহিতদের তিনি মনে করিতেন সর্বজ্ঞ। পুরোহিতরা রাজার সকল স্বপ্নকেই অহিত-কর বলিয়া গম্ভীরভাবে ব্যাখ্যা করিতেন এবং দোষক্ষালনের জন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ও যাগ-যজ্ঞ করিতে উপদেশ দিতেন। রাজা নত-মস্তকে অক্ষরে অক্ষরে তাঁহাদের উপদেশ পালন করিয়া ব্রাহ্মণদের বহু ভোজ্য ও দক্ষিণা দিতেন। কেবল স্বপ্ন কেন, একটা উল্কাপাত

হইলে, একটা শকুনি রাজপ্রাসাদের উপর দিয়া উড়িয়া গেলে, রাত্রি-কালে একটা কাক ডাকিলেও তিনি পুরোহিতদের পরামর্শে ঘটা করিয়া যজ্ঞ বা স্বস্ত্যয়ন করিতেন। দিনকতক খুব 'দীয়তাং, ভুজ্যতাং' চলিত, পশুবলি হইত, ঢাকঢোল বাজিত, স্থূলকায় ব্রাহ্মণগণ সশব্দে ঢেকুর তুলিত, সুবিধা পাইয়া রাজপুরীর ভৃত্য ও কর্মচারীরা দুই হাতে চুরি করিত, অর্থাৎ এককথায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইত।

একদিনের একটি ব্যাপারে তাঁহার যাগ-যজ্ঞ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ও পুরোহিতদের ব্যবস্থায় অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল। শুধু তাহাই নয়, একেবারে তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগ করিয়া বোধিসত্ত্বের ধর্ম গ্রহণ করিলেন।

একদিন অর্ধরাত্রে তিনি উপরি উপরি আটটি শব্দ শুনিতে পাইলেন—প্রথমে ডাকিল কয়েকটি বাদুড়, তারপর ডাকিল একটি কাক, তারপর ডাকিল একটি গাভী, তারপর ডাকিল একটি পোষা কোকিল, তারপর একটি বানর, তারপর একটি পোষা হরিণ, তারপর ডাকিল একটি অশ্ব এবং সর্বশেষে একজন মানুষ গান করিয়া পথ দিয়া চলিয়া গেল। উপরি উপরি আটটি ভিন্ন ভিন্ন জীবের এইরূপ ধারাবাহিক কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাজা ভয় পাইয়া গেলেন। তাঁহার আর ঘুম হইল না—সারারাত্রি কেবল ভাবিতে লাগিলেন—নিশ্চয়ই ইহা বিশেষ অশুভকর। এইরূপ আটটি জীব কি যেন বলিয়া কোন্ আসন্ন বিপদের কথা জানাইয়া দিল তাহা কে জানে? আটটি জীব একরূপ চক্রান্ত করিয়াই যেন একটির পর আর একটি কোন অশুভ কথা জানাইয়া গেল!

প্রভাত হইবামাত্র রাজা পাত্রমিত্র ও পুরোহিতদের আহ্বান করিয়া রাত্রির ব্যাপার সমস্ত জানাইলেন। প্রধান পুরোহিত বলিলেন—"মহারাজ, এ তো বড় অশুভসূচক! আপনাকে একটি বিরাট যজ্ঞ করতে হবে। একশত জন ব্রাহ্মণকে এ যজ্ঞে ব্রতী করতে হবে।"

রাজা বলিলেন—"যা কর্তব্য, আপনি করুন। আমার তো ভয়ে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে।"

পুরোহিত একটি প্রকাণ্ড ফর্দ রচনা করিলেন—তাহাতে এক হাজার ভিন্ন ভিন্ন পশুবলির ব্যবস্থা হইল। এক মাস ধরিয়া এই যজ্ঞ চলিবে। এক সপ্তাহের মধ্যে যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন হইল, সমস্ত নগরে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এক হাজার পশু সংগৃহীত হইল—তাহারা যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া সমস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিল।

প্রধান পুরোহিতের এক যুবক শিষ্য বলিলেন—"গুরুদেব, আপনি কেন রাজাকে অযথা এই যজ্ঞে ব্রতী করলেন? কেন অযথা রাজকোষের এত অর্থ ধ্বংস করছেন? রাজা আটটি শব্দ উপরি উপরি শুনেছেন—তাতে ক্ষতিটা কি? একশতটাও তো শুনতে পারেন। চারদিকে জীবজন্তু থাকলেই তারা শব্দ করবে, এতে বৈচিত্র্যই বা কি আছে? আপনি তো আমাকে সর্বশাস্ত্রই শিখিয়েছেন—কোন্ শাস্ত্রে আছে যে, এইরূপ শব্দ-শ্রবণ অশুভসূচক এবং কোন্ শাস্ত্রেই বা আছে যে, এইরূপ শব্দ শুনলে প্রকাণ্ড একটা যজ্ঞ করতে হবে? কোন্ স্মার্তসংহিতায় এ কথা আছে?"

পুরোহিত—বাপু, তুমি থাম। যে শাস্ত্রে এইসব আছে, সে শাস্ত্রটি তোমাকে পড়ানো হয়নি। সে শাস্ত্রটি শিখতে তোমার প্রবৃত্তিও নেই। এ ব্যবস্থা আছে স্বার্থসংহিতায়, কোন স্মার্ত-সংহিতায় নয়। জান তো বাপু, বহুদিন হতে কোন মোটা রকমের পাওনা হয়নি। মাসিক বরাদ্দ বৃত্তিতে আর চলে না। এরূপ একটা কিছু না হলে পুত্র-পরিবার কি করে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে? তোমারও পুত্র-পরিবার হলে আপনা হতেই এ শাস্ত্রে জ্ঞান হবে। তার আগে বুঝবে না।

শিষ্য—তবে গুরুদেব, ও সবের মধ্যে আমি নেই। এইরূপ প্রবঞ্চনা করে দক্ষিণা আদায় করা আমি মহাপাপ মনে করি। রাজা ধর্মান্ধ ও ভীরুস্বভাব, তাই তাঁকে বোকা বানিয়ে অর্থ-উপার্জন! এর মধ্যে আমি নেই।

পুরোহিত—মূর্খ, একমাস যে পেট ভরে মাংস খেতে পাবে—পায়স-পিষ্টকে পেট ভরাতে পাবে, তা ভুলে যাচ্ছ কেন? দান-দক্ষিণা কিছু না হয় নাই নিলে। আহারটা যে ভাল হবে, তা কেন ভেবে

দেখছ না? কাঁচকলা সিদ্ধ ভাত খেয়ে খেয়ে কি বিরক্তি লাগছে না? মুখ বদ্‌লাতে ইচ্ছে করছে না? রাজার অভাব কি বাপু?

শিষ্য—না, গুরুদেব, আমি এরূপ আহারকে শকুনির আহার মনে করি। আমি বিদায় নিলাম।

পুরোহিত—তুমি চলে যেতে পার, তোমার মত হস্তি-মূর্খ শিষ্যে আমার প্রয়োজন নাই। তুমি তোমার ধর্মবুদ্ধি নিয়ে থাক। কখনও তোমার অন্ন জুটবে না। আমরা রাজার বুদ্ধিকে দানে প্রবর্তিত করে ধর্মাচরণই করছি—নিজেদের পুত্র-পরিবারকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতে চেষ্টা করেও ধর্মাচরণ করছি। রাজার এতে পুণ্য হবে—আমাদেরও লাভ হবে।

শিষ্য চলিয়া গেল, কিন্তু ভাবিতে লাগিল—কি করিয়া রাজাকে বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে, তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করা হইতেছে। নিজে রাজার কাছে যাইয়া বলিতে সাহস করিল না—ধর্মান্ধ ভয়াতুর রাজা শুনিবেন না, উপরন্তু তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না।

তখন সে অনুসন্ধান করিয়া জানিল—রাজার উদ্যানে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট শিষ্য গিয়া সব কথা বলিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন—''দেখি আমি কি করতে পারি! রাজার যত ভক্তি ভোজনলোলুপ অর্থলোভী ব্রাহ্মণদের প্রতি—আমাদের ভিক্ষু-শ্রমণদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নেই। আমি বারণ করলে তিনি শুনবেনই বা কেন?''

শিষ্য—আপনি ভেবে একটা উপায় করুন। নইলে রাজা এইভাবে বার বার প্রবঞ্চিত হবেন এবং লক্ষ লক্ষ পশু অযথা জীবন হারাবে।

সন্ন্যাসী—দেখ, রাজা যদি আমাকে অষ্ট শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে আমি ব্যাখ্যা করে তাঁকে বুঝিয়ে দিতে পারি। নইলে আমি নিজে গিয়ে কিছুই বলব না।

শিষ্য তখন রাজার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল—''মহারাজ, আপনার উদ্যানে একজন শ্রমণ এসেছেন—তিনি আপনার শোনা আটটি শব্দের ব্যাখ্যা করতে পারেন। আপনি যদি উদ্যানে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—তা হলে সদুত্তর লাভ করবেন।''

রাজা উদ্যানে গিয়া শ্রমণকে প্রণাম করিয়া নিজের বিপদের কথা জানাইলেন।

শ্রমণ বলিলেন—"মহারাজ, এ আটটি শব্দের দ্বারা আপনার কোন অহিতই সূচিত হচ্ছে না। আপনি প্রথমে কয়েকটি বাদুড়ের শব্দ শুনেছিলেন। বাদুড়গুলি আপনার প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে প্রতিরাত্রে এসে ফল ভক্ষণ করত। সেদিন উদ্যানপালগণ ফলের গাছগুলোকে জাল দিয়ে ঘিরে ফেলেছিল। তাই বাদুড়গুলি দুঃখ করে বলছিল—'পাঁচ ক্রোশ দূর হতে ফলের আশায় এলাম—হায়, হায়, সব গাছগুলি জাল দিয়ে ঘেরা!'

আপনি তারপর শুনেছিলেন একটি কাকের শব্দ। আপনার হস্তিশালার তোরণের উপর একটি কাকী বাসা বেঁধেছে। আপনার একজন মাহুত হাতী নিয়ে যখন ঐ তোরণ পার হয়, তখন সে ঐ কাকের বাসায় অঙ্কুশের আঘাত করে। তাতে তার দুই-একটি করে ডিম ভেঙে পড়ে যায়। তাই ঐ কাকী দুঃখ করে বলছিল—'আমি কোন অপরাধ করিনি—মাহুতটা অনর্থক আমার ডিমগুলি ভেঙে দিচ্ছে! এ রাজ্যে কি তার কোন বিচার নেই?'

আপনি তৃতীয় শব্দ শুনেছিলেন একটি গাভীর। আপনার গোশালায় একটি গাভী আর্তনাদ করে বলছিল—'গো-পালকগণ এমনি নিঃশেষ করে তার দুধ দুয়ে নেয় যে, তার বৎসটি পেট ভরে খেতে পায় না। রাজার পেট কি কিছুতেই ভরে না? রাজার গোশালায় এত গাভী থাকতে কেন যে গোপালকগণ এমন করে নিঃশেষে দুধ দুয়ে নেয়, তাই ভেবে তার আক্ষেপ।'

আপনি চতুর্থ শব্দ শুনেছিলেন একটি পোষা কোকিলের। পোষা কোকিল বলছিল—'আমাকে কেন খাঁচায় বন্দী করে রেখেছ, বুঝি না। খাঁচায় থেকে আমি কখনও গান করি না—আমি আর্তনাদই করি। আমাকে যদি ছেড়ে দাও—তবে প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানের আম্র-বৃক্ষে আমি মনের আনন্দে গান করতে পারি—আমার আর্তনাদ শুনে রাজার কি লাভ হয়?'

আপনি পঞ্চম শব্দ শুনেছিলেন একটি পোষা হরিণের। হরিণটি

বলছিল—'আহা, সেই পর্বতের একটি ঝরণার ধারে কেমন স্বাধীন-ভাবে বিচরণ করে কচি কচি ঘাস খেতাম! সেখানে বাঘের ভয় ছিল সত্য, কিন্তু তেমন সুখের জীবন খাঁচার মধ্যে কি পাওয়া যায়? আমাকে বন্দী করে রেখে রাজার কি লাভ হয়, জানি না।'

আপনি ষষ্ঠ শব্দ শুনেছিলেন একটি পোষা বানরের। বানরটি বলছিল—'আমি ছিলাম বনে—কোনদিন রাজার উদ্যানে এসে রাজার কিছু ক্ষতি করিনি। কোন্ অপরাধে যে রাজা আমাকে বন্দী করে রেখেছেন, তা বুঝি না। আমাকে দেখে কেউ আনন্দও পায় না—কারো ইষ্টসিদ্ধিও হয় না।'

আপনি সপ্তম শব্দ শুনেছিলেন একটি অশ্বের। অশ্বটি বলছিল—'সহিস প্রত্যহ আমার দানা চুরি করে, আমি পেট ভরে খেতে পাই না। হায়, এত বড় রাজার রাজ্যে দেখবার কেউ নেই! দুর্বলতার জন্যে আমি রথ টেনে দ্রুত চলতে পারি না। সারথি ভাবে, আমি ইচ্ছে করে বুঝি আস্তে চলছি। তাই ভেবে আমার পিঠে কেবল কশাঘাত করে। রাজা দেখেও আমার দুঃখ বোঝেন না।'

শেষ শব্দ শুনেছিলেন আমার গানের। আমি গ্রামান্তর হতে উদ্যানে ফিরবার সময় গাইছিলাম—'রাজা কেবল অপাত্রে দান করে চলেছেন। হায়, প্রকৃত দান কাকে বলে জানেন না! হে তথাগত, রাজার সুমতি হোক, রাজাকে মূর্খদের হাত থেকে—দুর্জনদের হাত থেকে স্বার্থপরদের হাত থেকে রক্ষা করুন।'

অষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা শুনিয়া রাজার মন ভক্তিতে গদগদ হইল। সর্বজীবের প্রতি কারুণ্যে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল। পুরোহিতের শিষ্য তখন রাজাকে ভিতরকার কথা সব বুঝাইয়া দিলেন, এবং পুরোহিত কেন যে তাঁহাকে যজ্ঞাদিতে প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহাও বলিলেন।

রাজা রাজভবনে ফিরিয়া যজ্ঞ বন্ধ করিয়া দিলেন—পুরোহিতকে দূর করিয়া দিলেন এবং যজ্ঞের জন্য আহৃত পশুগুলিকে মুক্তি দিলেন। মাহুতকে ডাকিয়া কাকের বাসায় আঘাত করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। গো-পালকদের ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—বৎসগণের

উদরপূর্তির পর দুধ দোহাইবে। তিনি কোকিল, বানর, হরিণ ও অন্যান্য আবদ্ধ জীবজন্তুগুলিকে ছাড়িয়া দিলেন। যুবরাজকে ডাকিয়া বলিলেন—"তুমি নিজে উপস্থিত থাকিয়া অশ্বদের খাওয়াবে।" অশ্বের পৃষ্ঠে কশাঘাত করিতে সারথিদের নিষেধ করিয়া দিলেন এবং সন্ন্যাসীর নিকট নিজে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিলেন। রাজা রাজ্য হইতে যাগযজ্ঞ ও পশুবলি উঠাইয়া দিয়া দীনদুঃখী ও ভিক্ষু-শ্রমণদের জন্য দানশালা প্রতিষ্ঠা করিলেন।
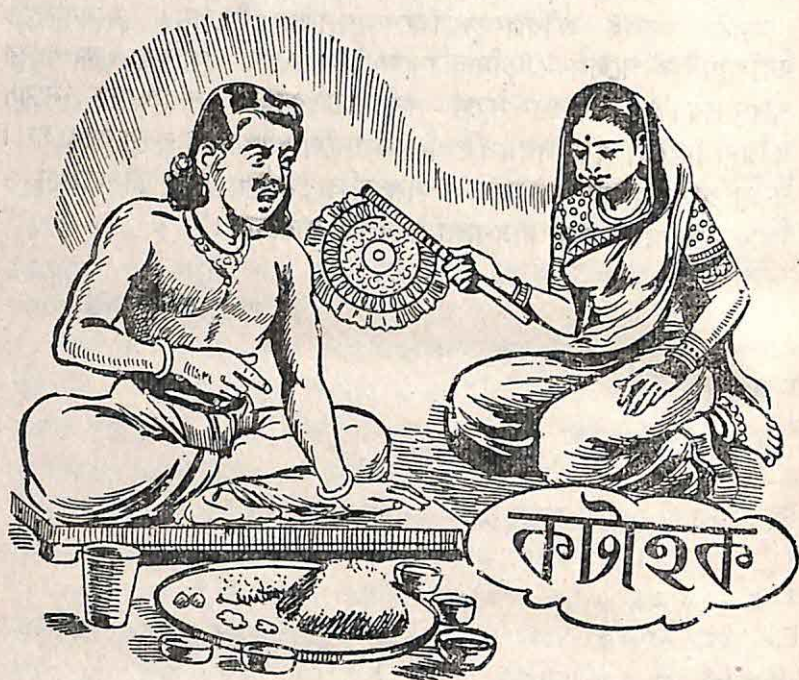
পুরাকালে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বুদ্ধদেব বারাণসীর একজন ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। একই দিনে তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে একটি এবং দাসীর গর্ভে একটি পুত্র জন্মে। দুই পুত্রই একসঙ্গে প্রতিপালিত হইতে লাগিল—দাসীপুত্রটি শ্রেষ্ঠীর পুত্রটির মতই বেশ প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিল। দাসীপুত্রের নাম কটাহক ও শ্রেষ্ঠীপত্নীর গর্ভজাত পুত্রটির নাম হইল সঞ্জীবক। শ্রেষ্ঠী সঞ্জীবককে লেখা-পড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিলেন—কটাহকের জন্য কোন ব্যবস্থাই করিলেন না। কটাহক তাহার ভ্রাতার পুঁথিপত্র বহন করিত এবং সঞ্জীবক যতক্ষণ গুরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত, ততক্ষণ সে বসিয়া বসিয়া পাঠ শুনিত।

এইভাবে সে তীক্ষ্নবুদ্ধির বলে সঞ্জীবকের চেয়ে অধিক বিদ্যা আয়ত্ত করিল। ইহা ছাড়া, সে গান-বাজনা শিখিল এবং আরও দুই-তিনটি শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিল।

শ্রেষ্ঠী তাহার বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যাবত্তা দেখিয়া তাহাকে ভাণ্ডারীর পদে নিযুক্ত করিলেন। কটাহকের এই কাজ ভাল লাগিল না। তাহার পেটে বিদ্যা ও ঘটে বুদ্ধি রহিয়াছে, সে প্রভু-পিতার ভাণ্ডারে তৈল, লবণ, ঘৃত, তণ্ডুল লইয়া জীবনটা নষ্ট করিতে পারে না। সে বিদেশে গিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের কথা ভাবিতে লাগিল। সে শুনিয়াছিল, মগধ দেশে শ্রেষ্ঠীর একজন বন্ধু আছেন—তিনিও খুব ধনশালী। কটাহকের মাথায় একটা ফন্দী আসিল। সে পরের হস্তাক্ষর জাল করিতে পারিত। মগধের শ্রেষ্ঠীর নামে সে একখানা চিঠি জাল করিল—

"সুহৃদ্বরেষু—

বহুদিন তোমার বার্তা অবগত নাই, আশা করি তুমি কুশলে আছ। আমার পুত্র সঞ্জীবককে তোমার কাছে পাঠাইতেছি। সে অনেক প্রকারের বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছে—তাহার ইচ্ছা দূরদেশে গিয়া বাণিজ্যাদি করে। তুমি ইহাকে আপন পুত্র জ্ঞান করিয়া নিজের কাছে রাখিয়া বাণিজ্য-বিদ্যা শিক্ষা দিবে। আর যদি তোমার বিবাহযোগ্যা কন্যা থাকে তবে ইহার সহিত তাহার বিবাহ দিতে পার। কিছুকাল পরে আমি নিজে গিয়া বধূমাতার সহিত পুত্রকে লইয়া আসিব। আশাকরি তেমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল। ইতি—

শ্রীরত্নদত্ত শ্রেষ্ঠী
বারাণসী"

এই পত্র লইয়া কটাহক মগধের শ্রেষ্ঠী মণিভদ্রের নিকট উপস্থিত হইল। মণিভদ্র কটাহককে পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কন্যা কনকপ্রভার সহিত কটাহকের বিবাহ দিলেন। কটাহক গৃহ-জামাতার পরম লোভনীয় পদে মগধের শ্রেষ্ঠীগৃহে স্থান পাইল।

শ্রেষ্ঠীর জামাতা হইয়া কটাহকের মাথা বিগড়াইয়া গেল। শ্রেষ্ঠীর গৃহে সেবা-যত্নের ত্রুটি ছিল না—কিন্তু কটাহক সবকিছুতেই দোষ ধরিতে লাগিল। কটাহকের বেশভূষা পছন্দ হয় না, সকল ঘৃতেই সে দুর্গন্ধ পায়, সকল মিষ্টান্নেই স্বাদুতার অভাব দেখে—পিষ্টক খাইতে দিলে বলে—ইষ্টক খাইতেছি ; পায়স খাইতে দিলে বলে—একি পায়স ? ইহা তো বারাণসীতে বায়সের খাদ্য। বারাণসীর পাচক যেমন রাঁধিতে পারে মগধের পাচক তেমন পারে না। বারাণসীর রজক যে কাপড় ধোয়, তাহা যূঁই ফুলের চেয়ে শাদা হয়, মগধের ফলগুলো কাশীর ফলের মত মিষ্ট নয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

কটাহক স্ত্রীকে বলে, আমার বাড়ীতে যখন তোমাকে নিয়ে যাব—দেখবে আমার বাপের কত ধনদৌলত, কত দাস-দাসী, কত হাতী-ঘোড়া।

কটাহকের স্ত্রী চুপ করিয়া সবই সহ্য করে।

শ্রেষ্ঠী রত্নদত্ত কটাহককে দেখিতে না পাইয়া তাহার খোঁজ করিতে লাগিলেন—দেশে দেশে চর পাঠাইলেন। একটি চর মগধ দেশে আসিয়া কটাহকের অবস্থা-পরিবর্তনের কথা রত্নদত্তকে জানাইল। রত্নদত্তের ক্রোধের সীমা থাকিল না। কটাহককে দণ্ড দিবার জন্য রত্নদত্ত নিজেই মগধ যাত্রা করিলেন। বার্তাবহ আগেই মণিভদ্রকে জানাইল—রত্নদত্ত দেখা করিতে আসিতেছেন। ইহা শুনিয়া তিনি খুব খুশী হইলেন এবং বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নানাপ্রকার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এই সংবাদে কটাহকের প্রাণ শুকাইয়া গেল ; সে যে কি করিবে, স্থির করিতে পারিল না। সে শ্বশুরকে বলিল—"আমি আমার পিতাকে এগিয়ে নিয়ে আসি, আমার সঙ্গে কিছু উপঢৌকন দিন।"

শ্বশুর তাহার হাতে যথেষ্ট উপঢৌকন দান করিলেন—কটাহকও বহু ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, সমস্তই সঙ্গে লইল। শোণ নদ পার হইয়া কটাহক রত্নদত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত ধনরত্ন চরণে অর্পণ করিল এবং চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কটাহক জাল চিঠির কথা কিছুই বলিল না। কেবল বলিল—"আমি আপনার

পুত্র পরিচয় দিয়ে অর্থাৎ সঞ্জীবক সেজে শ্রেষ্ঠীর কন্যাকে বিয়ে করেছি—আমার একটি পুত্র-সন্তানও হয়েছে। আমি দাসীপুত্র হলেও আপনারই তো প্রতিপাল্য। আমাকে রক্ষা করুন।”

রত্নদত্ত দেখিলেন—এখন সব প্রকাশ পাইলে কটাহকের বিপদ—তাহার স্ত্রী-পুত্রের বিপদ—শ্রেষ্ঠী বন্ধুরও বিপদ। তিনি অনেক ভাবিয়া বলিলেন—“তুমি আমাকে কি করতে বল?”

কটাহক বলিল—“আপনি আমাকে সঞ্জীবক বলে ডাকবেন এবং আমি যে দাসীপুত্র, সেটা গোপন করবেন। আপনি তা যদি না করেন, তা হলে বিষ-পানে আত্মহত্যা করব।”

রত্নদত্ত বলিলেন—“আচ্ছা যাও, তা-ই হবে।”

যথাকালে রত্নদত্ত মণিভদ্রের গৃহে উপস্থিত হইলেন। মণিভদ্র বন্ধুকে বেহাই বলিয়া সম্বোধন করিলেন। রত্নদত্ত মাসাধিক কাল মগধে ছিলেন—এই একমাস কাল কটাহক সর্বদা ভৃত্য হইয়া তাঁহাকে সেবা করিতে লাগিল।

একদিন কটাহকের পত্নীকে ডাকিয়া রত্নদত্ত বলিলেন—“মা, আমার মাথার পাকাচুলগুলো তোল দেখি।”

কনকপ্রভা পাকা চুল তুলিতে তুলিতে বলিল—“বাবা, আমরা কবে কাশী যাব? কবে আমাদের নিয়ে যাবেন?”

রত্নদত্ত—কেন, তোমরা এখানেই থাক, আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব। তুমি বাপের একমাত্র কন্যা, তোমাকে মা-বাপের কাছ-ছাড়া করতে ইচ্ছা নেই। এখনেই তোমরা থাক। সঞ্জীবক তোমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে তো?

কনক—হাঁ বাবা, উনি বেশ ভাল ব্যবহারই করেন। কেবল একটা দোষ আছে। এখানকার কোন জিনিস ওঁর পছন্দ হয় না। সকল খাদ্যেই উনি দোষ ধরেন, বলেন—কাশীতে ওঁর বাড়িতে সকল খাদ্যই এর চেয়ে ভাল করে তৈরি হয়—এখানকার সব জিনিসেই তিনি খুঁতখুঁত করেন—বাড়িতে তৈরী উৎকৃষ্ট গব্যঘৃততেও তিনি বিশ্রী গন্ধ পান।

রত্নদত্ত—বটে! সঞ্জীবক একেবারে যুবরাজ হয়ে পড়েছে! আচ্ছা,

আমি একটা মন্ত্র শিখিয়ে দি—এবার যেদিন কোন জিনিসে দোষ ধরবে, অমনি বলবে—

"কটাহকের জন্য খাবার কোন্ কটাহে রান্না করি?
কাশীধামে সেই কটাহের দাও গো বরাত তড়িঘড়ি।"

মন্ত্রটি সংস্কৃতে রচিত। কনকপ্রভা অর্থ বুঝিল না—বহু চেষ্টায় মুখস্থ করিয়া ফেলিল। রত্নদত্ত চলিয়া গেলেন। কটাহক দেখিল—আর ভয় কিসের?

কটাহকের মেজাজ আরও বিগড়াইয়া গেল। সে দাস-দাসীদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল—অত্যন্ত বেশি বিলাসী হইয়া পড়িল। তাহার হুঙ্কারে ও দাপটে শ্রেষ্ঠীপরিবারের থরহরি কম্প আরম্ভ হইয়া গেল। কটাহক শ্বশুরকে আর গ্রাহ্য করিয়া চলিল না—স্ত্রীকেও অবজ্ঞা করিতে লাগিল—খাবার জিনিসে তাহার দোষ ধরার অভ্যাস বাড়িয়া গেল। কত পাচক যে আসিল, আর কত পাচক যে গেল, তাহার ইয়ত্তা নাই; কেহই রন্ধনের দ্বারা কটাহককে তুষ্ট করিতে পারিল না। দাসদাসী পরিজন সকলেই কটাহকের ভয়ে সন্ত্রস্ত। দোষ ধরা ছাড়া কটাহকের যেন অন্য কাজ নেই।

একদিন কটাহক খাইতে বসিয়াছে—স্ত্রী কনকপ্রভা বসিয়া ব্যজন করিতেছে। কটাহক প্রত্যেক খাদ্যেরই দোষ ধরিতেছে, ক্রমে কনকপ্রভার ধৈর্যচ্যুতি হইতেছে। একখন্ড মাংস মুখে দিয়াই কটাহক চীৎকার করিয়া উঠিল—"এ অখাদ্য ভদ্রলোকে খায়? মগধের চামাররা এরূপ অখাদ্য খেতে পারে—কাশীর শ্রেষ্ঠীরা কখনও স্পর্শ করে না। শীঘ্র ডাবর আন, আমি বমি করব—আমার বমি আসছে—"

কনকপ্রভা দেখিল—আর মন্ত্র আবৃত্তি না করিলে চলে না। ডাবর না আনিয়া কনকপ্রভা বলিল—

"কটাহকের জন্য খাবার কোন্ কটাহে রান্না করি?
কাশীধামে সেই কটাহের দাও গো বরাত তড়িঘড়ি।"

ব্যস্, যেমন মন্ত্রপাঠ—অমনি সব জল! উদ্যতফণা ফণীর কাছে মন্ত্র পড়িলে যাহা হয়, ঠিক তাহাই হইল। কটাহক সংস্কৃত জানিত—মন্ত্রের অর্থটি বুঝিল এবং ইহাও তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না

যে, শ্রেষ্ঠী নিজে মন্ত্রটি শিখাইয়া গিয়াছেন। কটাহক একবার স্ত্রীর মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিল—তারপর তাহার বমি আসা বন্ধ হইল। সোনার চাঁদের মত মাংসের বাটিটা শেষ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

কটাহক একেবারে নূতন মানুষ হইয়া গেল! রাগ নাই, দ্বেষ নাই, দর্প নাই, হাঁক-ডাক নাই—কোন জাঁক নাই—একেবারে সুবোধ সুশীল গোপালটি! মগধের সকল খাদ্যেই সেদিন হইতে তাহার অমৃতের মত লাগিল। কনকপ্রভাকে আর দ্বিতীয়বার মন্ত্র পাঠ করিতে হয় নাই।
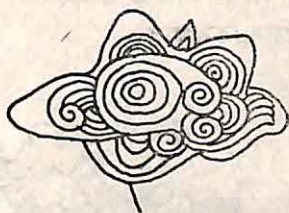
এই গ্রন্থমালার অন্যান্য বই

কথাসরিৎসাগরের গল্প। কৃষ্ণধন দে
রঘুবংশের গল্প। কৃষ্ণধন দে
নলোদয়ের গল্প। কৃষ্ণধন দে
পঞ্চতন্ত্রের গল্প, পূর্ণাঙ্গ। প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
পঞ্চতন্ত্রের গল্প, প্রথম খণ্ড। প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
পঞ্চতন্ত্রের গল্প, দ্বিতীয় খণ্ড। প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
মঙ্গলকাব্যের গল্প, প্রথম খণ্ড। প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
মঙ্গলকাব্যের গল্প, দ্বিতীয় খণ্ড। প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
জাতকের গল্প। কালিদাস রায়
বাল্মীকি রামায়ণের গল্প। ঋষি দাস
মহাভারতের গল্প। যামিনীকান্ত সোম
কথামালার গল্প। অশোককুমার

জাতকের গল্প